কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতির

আলোক-সম্পাত

প্রকাশক—
নির্মলচন্দ্র দত্ত
কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ী,
(নদীয়া)

দাম পাঁচ সিকা

আষাঢ়, ১৩৪৯

মুদ্রাকর—
অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী
নদীয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কৃষ্ণনগর।

শতদলের লেখ-নির্বাচনী সঙ্ঘে আছেন ঃ—

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম্, এ
বিনায়ক সান্যাল এম, এ
ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী বি, এ, বি, টি
বীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য বি, এস্-সি
ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী বি, এ
সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল

সম্পাদন করেছেন ঃ—

নীহাররঞ্জন সিংহ

কর্মসচিবের দায়িত্ব নিয়েছেন ঃ—

নির্মলচন্দ্র দত্ত

প্রচ্ছদপটের রূপ দিয়েছেন ঃ—

সুধীন্দ্র চক্রবর্ত্তী
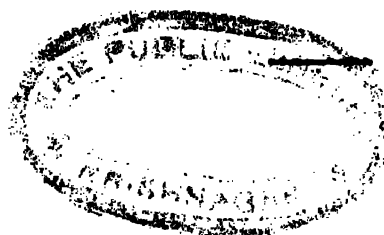
মন-পারাবারে ওঠে তরঙ্গ
অন্তর নাচে ছন্দে !
সুর-প্রবাহিনী সে সাগরে ধায়,
হিয়া বীণাপানি বন্দে !

মরম-সাগরে বিকসিল ফুল,
মৃদুল গন্ধে দুলিয়া দোদুল,
শতদলে শত পাপড়ী অতুল,
শত হিয়া হ'তে নন্দে !

সবা-মনে যেই ঝঙ্কারে বাণী,
গণ-অলি লোভে গুঞ্জরে জানি ;—
হাসে দেবী পদে অঞ্জলি দানি,
শতদল মৃদুমন্দে ।

সম্পাদকের কথা

কৃষ্ণনগর-সাহিত্য-সঙ্গীতির মুখপত্র শতদল বাহির হইল। নূতন কোন পত্রিকা বাহির হইলে তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিবার সনাতন রীতি আছে। আমার কৈফিয়ৎ—

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।

জনসাধারণের কাছে ইহাই আমার একমাত্র বিনীত নিবেদন, কৃষ্ণনগর-সাহিত্য-সমাজে শতদলের মত সাময়িক পত্রিকার 'প্রয়োজন' আছে কি না তাহা তাঁহারাই বিচার করিবেন।

এই পত্রিকা সম্পাদনায় আমার কোন কৃতিত্ব নাই; আমি শতদলের দলগুলি সাজাইয়াছি মাত্র। কৃতিত্ব তাঁহাদের যাঁহারা ইহার দলগুলি বর্ণে, গন্ধে, রূপে, রসে রূপায়িত করিয়াছেন।

এই সুযোগে আমার যুবক বন্ধু উদিয়মান সাহিত্যিক অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিতে চাই। একদিন যাহা আমার ও আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারি মহাশয়ের কল্পনায় ছিল তাহাতে রূপ দিয়াছে শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, তাহারই চেষ্টায় আজ শতদল প্রকাশিত হইল।

সাহিত্য-সঙ্গীতির শতদল বর্ষে বর্ষে আত্মপ্রকাশ করুক ইহাই আমার অন্তরের বাসনা। পরিশেষে গ্রন্থখানির মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। ইত্যলম্।

প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন ঃ

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্-এ।

কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বি-এ।

পণ্ডিত বৈদ্যনাথ দত্ত সঙ্গীত-সুধাকর।

ভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি-এ, বি টি।

মোহনকালী বিশ্বাস।

মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্তী।

প্রফুল্লকুমার সরকার এম এ, বি-টি, ডিপ্, এড্

(এডিন ও ডাব)
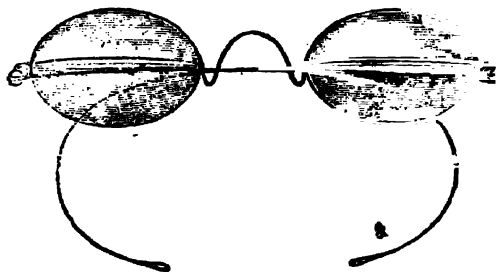
নিবেদন

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণেরাই জাতির উত্তম পুরুষ, আশা ভরসা তাহাদেরই উপরে, তাহাদেরই জন্য আমি কবিতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতেছি। যৌবন কাল হইতেই আমি কাব্য প্রিয়, কারণ কাব্য পাঠে আমি পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। ভাল ভাল কবিতা গুলি পড়িয়া পড়িয়া সে গুলি মুখস্থ হইয়া যাইত। খাঁটি কাব্যের ইহাই একটি বিশেষ লক্ষণ। কবির মনের কম্পানমালা পাঠকের মনে রূপ ধরিয়া থাকে। "নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া"। নিস্তরঙ্গ মনে ভাবের অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। সাহিত্য বোধের বস্তু, অনুভূতি হইতেই সাহিত্য শিল্পের উৎপত্তি। বাণী ভক্তেরা রচনার উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শব্দ-প্রয়োগ-নৈপুণ্যে ভাবটিকে পাঠকের বোধগম্য করান। পাঠকের মনের 'ক্যামেরা'তে রসমর্ম্মের ফটো গৃহীত হয়। "একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্ত ইহলোকে কামধুক্ ভবতি"। কাব্য পাঠকালে মনে হয় কবি যেন আমারি মনের ইতিহাস, আমারি অন্তরের ব্যথার আভাস ইসারায় ব্যক্ত করিতেছেন। কবিতায় যাহা বক্তব্য, ব্যঞ্জনায় তদতিরিক্ত কিছু বলা হইয়া থাকে। সাহিত্যেই জাতির আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় এবং জাতিকে সর্ব্বদেশে সম্মানিত করে। সাহিত্যের

যজ্ঞ বেদীতেই আমরা অখিল-রসামৃত মূর্ত্তির প্রকাশ-মহিমা দেখিতে পাই। সমুদ্রে যেন সূর্য্যোদয় হয়। মানুষের মুক্তি-ক্ষেত্র-স্বরূপ এই সাহিত্যের রসবস্তুই ব্রহ্মানন্দ-সহোদর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

শব্দই ভাবের বাহন। শব্দগুলি বর্ণ সমষ্টি মাত্র। রচনায় কোন্ কোন্ বর্ণগুলি রসপ্রকাশের পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহা নিরূপিত হইয়াছে। নানা গ্রন্থ বারংবার অধ্যয়ন এবং প্রত্যহ রচনা করিবার অভ্যাস না করিলে সিদ্ধকাম হওয়া যায় না। কর্ম্ম করিতে করিতেই জ্ঞান জন্মে। এই "সাহিত্য সঙ্গীতির" মত বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বাণীর পূজারীগণ সাধনা আরম্ভ করুক—ইহাই আমার কামনা। সক্রিয় কালের নিঃশব্দ ধারায় অনন্তের বৃহত্তম দূরত্বের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। Poetry is to engulf the infinity রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রসভঙ্গ হয়,—যদি রচনায় রসের পরিপন্থী বর্ণের আধিক্য হয়—কাব্যের ব্যাকরণ এখনও লিখিত হয় নাই। কাব্যের পাত্র বা পাত্রীকে আশ্রয় করিয়া রসের উদ্দীপন করিতে হয়। রস-বিশেষে বিশেষ বিশেষ উদ্দীপন নির্দ্দিষ্ট আছে। ভাল লাগিলেই রসের উদ্রেক হইয়াছে পাঠকের বুঝিতে হইবে। দুঃখের কাহিনীতে করুণ রসের উদ্দীপক বর্ণমালার এবং চিত্রাবলীর প্রয়োজন। শব্দের উপর অধিকার লাভ করিবার চেষ্টাই বাণী-সাধনা। লেখকের চিত্ত-প্রসাদ না থাকিলে সাধনা সফল হয় না। মানুষের মনের অনেক কম্পন এখনও অলিখিত আছে। সিনেমা-হলে বসিয়া কোন ছবি দেখিবার সময়ে আমরা

কিছুক্ষণ বহির্জগতের কথা ভুলিয়া থাকি, রসে ডুবিয়া যাই। এই আত্মবিস্মৃত অবস্থা সৃষ্টি করেন মহাকবিরাই। অন্তঃকরণের রসনায় যাহা আস্বাদিত হয় তাহাই রসপদবাচ্য। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সাহায্যে আমরা রস লোকে উপনীত হই। অতৃপ্তিই রসকে নিত্য নূতন করে। পুনর্মিলন পুনর্বিরহই রসের আত্ম স্থান, মহাকবিদের ছন্দের শতদল বন্ধে ধৃত হইবা মাত্র রস ধারা পুনর্মুক্ত হইয়া যায়। পাঠকের মনে ঝঙ্কার তোলে কবির নির্ব্বাচিত শব্দমালা। ভাষাই ভাবের ধারার ধ্বনি। মধুর রসাত্মক ভাব শ্রুতিসুখকর শব্দের দ্বারা এবং কর্কশ ভাব অর্থাৎ বাস্তবের সহিত বাস্তবের রূঢ় সংঘর্ষ শ্রুতিকটু শব্দের দ্বারা ব্যঞ্জনা করাইতে হয়। ঘাতপ্রতিঘাত প্রকাশের ভাষা, প্রীতিস্নেহের ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত। কবিরা স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—সেখানে সন্ধ্যা বেলায় আনন্দের বাঁশী বাজিতেছে, নদীহৃদয় নাচিতেছে, সেখানে চিরন্তন চাঁদের আলো, ফুলের মালায় সেখানে নিত্য নূতন মহোৎসব। ঋতুরাজ বসন্ত সেখানে কলকণ্ঠের নিত্য-সাহিত্যে উল্লাসিত। সাহিত্য শব্দের অর্থ সহচরত্ব। সাহিত্য শব্দটির আর এক অর্থ আছে। হিতের সহিত বিদ্যমান যাহা তাহা স-হিত এবং ঐ স-হিতের ভাবই সাহিত্য।

ভারত চন্দ্র কবিদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "শবদে শবদে বিয়া, দেয় যেই জন" রচনায় কোন্ ভাবটির সহিত উহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ভাবগুলি একাসনে বসিতে পারে সাহিত্য-মর্য্যাদায়

ন্যূনতর নহে, আভিজাত্য গৌরবে হীনতর নহে, কবির প্রতিভাই তাহা নিরূপিত করিয়া দেয়। কবিতাকে বিশ্লেষণ করিলে তাহা রসহীনা হইয়া যায়। রচনা বাক্য-কৌশল। কবিতা প্রসাধিতা করিতে হয়, তাহার ভিতরে শব্দদ্বারা ছবি আঁকিতে হয়, বর্ণদ্বারা রসরূপ ফুটাইতে হয় এবং ছন্দোবদ্ধ করিলেই বাক্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে। **Poetry is the most powerful speech.** কবিতা স্বতঃই উৎসারিত হয়। চেষ্টার ফল নহে। কবিতা রসোভঙ্গকারী পাষাণ-খণ্ডকে উৎসমুখ হইতে সরাইয়া দেয়।

আজ স্ফোট সম্বন্ধে এখানে দু'একটি কথা বলিব। যদিও লেখকের অজ্ঞাতসারে স্ফোট স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে; তথাপি তৎসম্বন্ধে দু'একটি কথা কাব্যামোদীর অবগত হওয়া দরকার। স্ফোট শব্দের অর্থকে স্ফুটতর করে। বাক্য এবং অর্থ হরগৌরীর ন্যায় একাত্ম। ধ্বনিই শব্দ, ধ্বনি অর্থ-বোধক নহে। ধ্বনি এবং স্ফোট উভয়ের পার্থক্য আছে। স্ফোটের তিন প্রকার ভেদ। এক—যাহা কর্ণেন্দ্রিয়ে প্রতীয়মান তাহাই 'বৈখরী'। দুই—যখন বৈখরী স্ফোটের প্রতিভাস হয় (বক্তা ও শ্রোতার অন্তঃকরণ মধ্যে) তখন এই স্ফোটকে 'মধ্যমা' বলা হয়। মধ্যমা হইতেই অর্থের বোধ জন্মে। তিন—পশ্যন্তী স্ফোট, ইহা লোক ব্যবহারের অতীত। পশ্যন্তী যখন শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থায় থাকে তখনই তাহাকে বৈখরী বলা হয়। পশ্যন্তী স্ফোট এক অনাহত ধ্বনি। বৈখরী

অন্তঃকরণ গ্রাহ্য হইবা মাত্র মধ্যমা বলা যায়। ফল কথা ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোটই অর্থ বোধক।

কবিতা সম্বন্ধে সারাজীবন ধরিয়া বলিলেও কথা ফুরায় না, হৃদয় তৃপ্ত হয় না। "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয় জুরন ন গেল' যাহা মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় তাহাই কাব্য। সেই কাব্য সম্বন্ধে বলিতে বসিলে এই সময় টুকুতে কুলাইবে না তাই এইখানেই আমার কাব্য-প্রীতির উচ্ছ্বাস সীমাবদ্ধ করিলাম। অসীমের মানচিত্র সীমা রেখার দ্বারা বেষ্টিত করিবার দুরাশা আমার নাই।*

---

* কৃষ্ণনগর সাহিত্য সঙ্গীতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ।

"অনেকগুলি একক সাধনা—একক শক্তিই সঙ্ঘ শক্তি। সঙ্গীতি সঙ্ঘের নামান্তর। সাহিত্য সাধনায় যাঁরা আত্মানন্দ লাভ করেন, দেশকে সত্যানন্দের সন্ধান দেন তাঁরাই সাহিত্যিক। এঁদের প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানকে সাহিত্য সঙ্গীতি বলা হয়।"
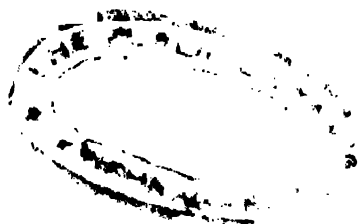
সাহিত্যে শিক্ষানবিশি

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাংলার বিভিন্ন সহরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, এমন কি গণ্ডগ্রামে আজ সাহিত্যালোচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,—সাহিত্যসভা, সাহিত্যিক আলোচনা আজ একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপারের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন না কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকা আজ অল্পবিস্তর গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা, চিঠি লেখা বা বক্তৃতা করার মধ্যে আজ আর তেমন লজ্জা বা ন্যূনতা বোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেই আজ সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা নেহাত পক্ষে একখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া অনেকেই সাহিত্যিকত্বের দাবী পাকা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বাঙালী বাংলাকেই জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার একমাত্র উপযুক্ত ভাষা বলিয়া মনে করিতেছেন – বাংলার এই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাগ্রহ প্রচার কার্যে লাগিয়া গিয়াছেন। বাংলার বাহিরে বাংলা ভাষার প্রসার-বৃদ্ধির জন্য অনেকে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। মোটের উপর সকল দিকেই নবীন আশার নয়নমোহন আলোকরাশি উদ্ভাসিত হইতেছে।

কিন্তু দোষদর্শী শিক্ষক তাহাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার এ অতৃপ্তি তাঁহার প্রকৃতিগত সুতরাং উপেক্ষণীয়, এরূপ ধারণা স্বাভাবিক হইলেও এই স্বাতন্ত্র্যের যুগে একবার সুধীজন এই 'উল্টা' মনোভাবের কারণগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন না কি ?

সত্য বটে, 'সর্বঃ কান্তমাত্মানং পশ্যতি' সকলেই নিজেকে সুন্দর মনে করে—নিজের জিনিষ সকলের চক্ষেই নির্দোষ। কিন্তু একথাও কি সত্য নয় যে মানুষ যাহাকে যত বেশী ভালবাসে তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কাও তাহার চিত্তে তত বেশী—'স্নেহঃ পাপশঙ্কী ভবতি' ? যাহার প্রতি আমার মমত্ববোধ নাই তাহার ইষ্টানিষ্টে আমি তেমন বিচলিত হই না—তাহাকে যদি প্রশংসা করি তবে অনেকক্ষেত্রে তাহার প্রধান অথবা একমাত্র কারণ অনর্থক (?) তাহার বিরুদ্ধতাচরণ করিতে চাহি না—সে প্রশংসার অন্তরালে একটা ঔদাসীন্য লুক্কায়িত থাকে—সে প্রশংসা অতি অল্পস্থলেই দীর্ঘকালব্যাপী ধীর বিবেচনার ফল। নিজের জন সম্বন্ধেও যদি আমরা এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করি তবে তাহা নিদারুণ দুঃখের বিষয়—গভীর ভবিষ্যৎ অকল্যাণের কারণ। তাই আমাদের পরম আদরের ও নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্তু জননী বঙ্গভাষার সম্বন্ধে আলোচনার সময় স্বতই আমাদের মনে ইহার দুঃখদৈন্য অভাব অভিযোগ ত্রুটিবিচ্যুতির কথা জাগিয়া উঠে।

তাই যখনই দেখি কেহ ভাষাজননীর—বঙ্গসাহিত্যের সেবার অজুহাতে নিজের মাহাত্ম্যপ্রচারেই ব্যস্ত যখনই দেখি জননীকে সাজাইবার নাম করিয়া কেহ বালসুলভচপলতাবশতঃ অনিপুণ হস্তে প্রস্তুত অসার খেলনার সামগ্রী দিয়া তাঁহার দেহকে নিপীড়িত করিতেছে এবং সেজন্য নিতান্ত আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেছে, তখন এই ছেলেখেলা দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝি না। যখনই দেখি সাহিত্যসেবার কার্য্যে অনেকেই পরম আস্তিকের মত ভগবদ্দত্ত স্বকীয় নৈসর্গিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন—অন্যান্য বিষয়ের মত এ ক্ষেত্রে কোনও শিক্ষানবিশির প্রয়োজন অনুভব করেন না তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া থাকিতে হয়। সকল ব্যাপারেই সাফল্য-লাভের জন্য চাই সাধনা, চাই দীক্ষা, চাই সংযম, চাই পরিশ্রম। যে কোনও বিষয়ে অধিকারলাভের জন্য এই কয়টিই হইল প্রথম সোপান। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের নানা প্রচেষ্টার মত সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেও এই অপরিহার্য প্রথম সোপানগুলি উপেক্ষা করিয়াই অনেকে মন্দিরশিখরে আরোহণ করিবার বিফল প্রযত্ন করিয়া একদিকে সুধীজনের উপহাসাস্পদ হইতেছেন অপরদিকে সমব্যবসায়ীদের উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া সোপানগুলির অবমাননা করিতেছেন। অন্ধের মত সকলেই ছুটিয়াছেন গভীর অন্ধকারের দিকে।

ফলে বাংলা সাহিত্যে আজ এক গুরুতর উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাব ও রসের মর্যাদা রক্ষার কথা এস্থলে তুলিব না।

অবশ্য সেদিকেও দারুণ দুরবস্থার অগণিত নিদর্শন বিরাজমান। বস্তুতঃ সাহিত্যের মূল অবলম্বন ভাষাই যেখানে বিকৃত ও কলুষিত সেখানে আশ্রিত সাহিত্যে মাধুর্য ও চমৎকারিত্বের আশা করা অনেক সময়ই বাতুলতামাত্র। সাহিত্যের প্রকৃত রসস্ফূর্তি ও উৎকর্ষসাধনের জন্য চাই ভাষার বিশুদ্ধি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাষার বিশুদ্ধির কথা তুলিলেই অনেকে ভ্রূ কুঞ্চিত করেন —উচ্চকণ্ঠে বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না যে বাংলা ভাষা জীবিত ভাষা, ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ইহার মধ্যে চলিবে না। অথচ ইংরাজী প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত সমৃদ্ধ ভাষা সম্বন্ধে এ রকম যুক্তি বা তদনুযায়ী প্রয়োগ আদৌ দেখা যায় না। বস্তুতঃ, এমন অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'পদ্মবনে মত্তকরিসম বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজীর ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন'। ফলে, বর্তমানে বাংলা ভাষায় যে অরাজকতা চলিতেছে কোনও সমুন্নত জাতির ভাষায় বোধ হয় তাহা চলে না। সত্য বটে, বহুল ব্যবহারের ফলে ক্রমে সকল ভাষায়ই এমন অনেক প্রয়োগ মানিয়া লওয়া হয় যেগুলি ব্যাকরণানুগত নহে—অনেকক্ষেত্রে সেই সকল প্রয়োগের খাতিরে ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়মেরও সংশোধন করা হয়—নূতন নূতন নিয়ম গড়িয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাকরণকে তুচ্ছ করিয়া বা ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতা-

বশতঃ ব্যাকরণবিরোধী নিত্য নূতন শব্দের প্রয়োগ কোনও ভাষায়ই কখনও সমর্থিত হইতে পারে না। আর আধুনিক বাংলা ভাষার এমনই দুর্ভাগ্য যে পদে পদে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে। সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য জ্ঞাতসারেই যে এরূপ করা হইয়া থাকে এমন কথা বলা চলে না। অনেক ক্ষেত্রেই এ জাতীয় প্রয়োগের মূল কারণ অজ্ঞতা বা অনবধানতা। চঞ্চলিত, সচঞ্চল, মৎলিখিত, শরৎচন্দ্র, চলমান, অস্তমান, মুহ্যমান, পুঞ্জীয়মান, দুল্যমান, ভ্রাম্যমাণ, আহরিত, সিঞ্চিত, আর্বরিত, প্রমাণিত, মহদন্তকরণ, মহদাশয়, নিরলস, নিরহঙ্কারা, সততা, বৈরতা, প্রসারতা, নিশ্চয়তা, উৎসর্গীকৃত প্রভৃতি অসংখ্য অশুদ্ধ পদ বাংলা ভাষার সম্পদ্ ও গৌরব বাড়াইয়া তুলিয়াছে একথা মনে করা চলে না। আর এই গুলিকে শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলেই বাংলা ভাষার অমর্যাদা হইবে এমনও নয়।

শব্দের রূপবিকৃতি যেমন ভাষাকে অসুন্দর করিয়া তোলে অর্থবিকৃতি ও অর্থের অস্পষ্টতাও সেইরূপ ভাবপ্রকাশের প্রতিকূলতা করিয়া থাকে। শব্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া তাই অনেকে অনেক সময় অনুপযোগী শব্দরাশি প্রয়োগ করিয়া পাঠকের সন্ত্রাসের কারণ হইয়া উঠেন। সেদিন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম একখানি নূতন চিত্রের পরিচয়দান প্রসঙ্গে 'রূপরসগন্ধ-মধুর চিত্র' এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। চিত্রের রূপ বোঝা

যায়, রসও না হয় অনুমেয় কিন্তু গন্ধ কি ? তাই অনেক স্থলে অর্থ বুঝিতে হইলেই অক্ষরার্থকে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অবশ্য, কোনও শব্দই সাহিত্যিকের হাতে সকল সময় অভিধাননির্দিষ্ট বাঁধাধরা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না—মূল অর্থ হইতে নানা গৌণ অর্থের উদ্ভব হইয়া শব্দের মাধুর্য বাড়াইয়া তোলে এবং সাহিত্যিক রসের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহারও একটা নিয়ম আছে। কোনও বিশেষ চমৎকারিত্ব না থাকিলে অযথা কোন শব্দের স্বকপোলকল্পিত অর্থে প্রয়োগ কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যাহাই লিখি না কেন তাহার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়—যদি ছত্রে ছত্রে রহস্য থাকে তবে লেখার উদ্দেশ্য অনেক সময়ই ব্যর্থ হইয়া যায়। দর্শনাদি গুরু বিষয় ছাড়া কাব্যনাটকাদির প্রধান লক্ষ্য হইল 'সদ্যঃ-পরনির্বৃতি'—পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পরম পরিতৃপ্তিলাভ। প্রত্যেক লেখককে সকল সময় এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে পাঠকের মন কেবল শব্দের মোহে মুগ্ধ করিলে চলিবে না—অর্থের স্পষ্টপ্রতীতি যাহাতে সাহিত্যরসপিপাসুর চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহার ব্যবস্থা লেখককে প্রতি পদে করিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এক দিকে গভীর ঔদাসীন্য ও অপর দিকে সর্বনাশকর আত্মম্ভরিতা আমাদিগকে গভীর মোহে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই প্রয়োগগুলির সাধুতাবিচার করিয়া দেখা অযথা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও মূল্যবান্ সময়ের নির্বোধোচিত অপব্যবহার

বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অথচ ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনেকের নিকটই এই সমস্ত ত্রুটি ধরা পড়িবে। ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে শব্দের বিশুদ্ধ প্রয়োগ নির্ণয় করা একেবারে অসাধ্য নহে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে— যাঁহাদের রচনায় বাংলা সাহিত্য গৌরবান্বিত—যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া শাশ্বত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের লেখার মধ্যে এ জাতীয় ত্রুটি অতি সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ আদর্শের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলেই ব্যর্থতার আশঙ্কা ঘনীভূত হইবে।

পরের ছিদ্রান্বেষণ ও পরনিন্দাই আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি কেহ সেরূপ মনে করেন তবে নিতান্তই অবিচার করা হইবে। বাংলা সাহিত্যের যাঁহারা প্রকৃতই সেবা করিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—এই সেবার অধিকার লাভ করার জন্য তাঁহাদের গুরুর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে গুরুকরণব্যতীত কোনও সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্ভবপর নহে। তবে ভরসার কথা এই যে সাহিত্যা-রাধনার জন্য সকল সময় জীবিত গুরু বরণ না করিলেও চলিতে পারে। কেবল বিচার করা দরকার যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতেছি গুরু হইবার উপযুক্ত গুণ তাঁহার আছে কি না—সদ্‌গুরুর নির্দেশ মত তিনি সৎপথে চলিয়া নিজে প্রকৃত সাহিত্যের সাধক হইয়াছেন কিনা। এইরূপ গুরুর মৌখিক বা গ্রন্থাকারে লিখিত

উপদেশ বা আদর্শ শ্রদ্ধার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করিলে সাহিত্যসেবার অধিকার জন্মিবে—সেবা সার্থক হইবে—বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী ধন্য হইবে। এই গুরুকরণই হইল এখনকার শিক্ষানবিশি। আধুনিক জগতে বিভিন্ন বিভাগ শিক্ষানবিশির কঠোরতা গুরুসেবার অপেক্ষা আদৌ কম নহে—অথচ তাহা সর্বসাধারণের অপরিহার্য। শিক্ষানবিশির সময়ে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় আপাততঃ তাহা ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে পারে—শিক্ষানবিশিকালে নির্মিত অনেক জিনিষ উপেক্ষিত, অগ্রাহ্য ও পরিত্যক্ত হইতে পারে; তাই বলিয়া শিক্ষানবিশিকে অবহেলা করার উপায় নাই। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতদিন এই শিক্ষানবিশির গুরুত্ব ও আবশ্যকতা সাহিত্যসেবাভিলাষিগণ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিবেন—প্রথম সৃষ্টির মোহ ত্যাগ করিতে না পারিবেন ততদিন সুফললাভের সম্ভাবনা কম।

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ স্মরণ করাইয়া দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'এ পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজের অনুরাগেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা শিখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই।......কিন্তু সকলের শক্তি সমান নহে; অশিক্ষা ও অনভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কর্তব্য পালন সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং বাংলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা বলিয়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষা ও নৈপুণ্যের আবশ্যক করে।'

সারনাথ

কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বেনারস থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে সারনাথ। বি, এন্, ডব্লু, রেলের একটি ষ্টেশন আছে ওখানে। ষ্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে বৌদ্ধ ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি সারনাথ। ষ্টেশন থেকে আম্রবৃক্ষছায়াঘন একটি পিচের রাস্তা দ্রষ্টব্য স্থান পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে অধিকাংশই মৃত্তিকাগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষ. — কিছু কিছু কালের ভ্রূকুটি সহ্য করে দণ্ডায়মান!

সারনাথের প্রাচীন নাম ছিল 'ঋষিপতন' বা 'মৃগদাব'। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান প্রথম নামকরণের কারণ বর্ণনা করেন,—তিনি খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথমপাদে ভারতে আসেন। তাঁহার মতে গৌতমবুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের বিষয় অবগত হয়ে কোন এক সাধক এখানে নির্বান লাভ করেন, তাই এ স্থানের নাম হয় "ঋষিপতন"। দ্বিতীয় নামকরণের কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, সারনাথ বহু প্রাচীনকালে মৃগচারী অরণ্যে পূর্ণ ছিল। বুদ্ধ পূর্বজন্মে এক মৃগযূথের দলপতি ছিলেন। কাশীর তৎকালীন রাজা ঐ বনে মৃগয়া ব্যপদেশে বহু প্রাণী হত্যা করতেন। দলপতি বুদ্ধ প্রত্যহ একটি মাত্র মৃগ রাজসমীপে পাঠাবার অঙ্গীকারে বহু

হত্যা নিবারণ করেন। একদিন একটি আসন্ন প্রসবা হরিণীর পালা আসে। দয়াপরবশ হয়ে বুদ্ধ নিজে রাজসকাশে উপনীত হন। রাজা বুদ্ধকে চিনতে পেরে এবং তাঁর আসার কারণ জেনে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর আদেশে ঐ অরণ্য মৃগগণের অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত হলো। তাই এর নাম হলো 'মৃগদাব' (Deer Park)। জেনারেল কানিংহামের মতে "সারঙ্গনাথ" থেকে বর্তমান সারনাথ নাম হয়েছে। সারঙ্গনাথের অর্থ মৃগপতি বা বুদ্ধ। কাহারও মতে 'সারঙ্গনাথের' অর্থ শিব এবং ঐস্থানে প্রাচীন ভগ্নস্তূপের প্রায় আধ মাইল পূর্বে যে প্রাচীন শিব মন্দির বর্তমান তারই প্রতিষ্ঠার জন্যে অনুরূপ নামকরণ হয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আবিষ্কৃত প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে গৌতমবুদ্ধের ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালের (৫২৮ খ্রীঃ পূঃ) এই স্থান 'ধর্মচক্র' বা 'সৎধর্মচক্র-প্রবর্তন' নামে খ্যাত ছিল।

গয়ায় বুদ্ধত্ব লাভের পর এই স্থানে প্রথম বুদ্ধের বাণী তাঁর নিজ মুখ থেকে উৎসারিত হয়। বুদ্ধদেব তাঁর মহানির্বানের পূর্বে শিষ্যগণকে চারিটি স্থান দর্শনের অভিলাষ জানান। জন্মস্থান (কপিলাবস্তু), বুদ্ধত্বলাভের স্থান (গয়া), প্রথম প্রচার স্থান (সারনাথ) ও মহানির্বান স্থান (কুশীনগর—বর্তমান গোরখপুর জেলার কাশিয়া)। তাই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের নিকট সারনাথ তীর্থক্ষেত্র।

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী মানব মোক্ষলাভের আশায় এই তীর্থস্থান দর্শন করেছে ; নিজের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ বিহারে, স্তম্ভে ও স্তূপে পাথরের বুকে রূপায়িত করেছে। কিন্তু মহাকালের নিষ্ঠুর অনুশাসনে অধিকাংশই মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন হয়েছিল। সেই প্রাচীন গৌরবের অনির্বান শিখা পুনরায় ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়ে ভারতের অতীত ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সারনাথ জৈনদেরও তীর্থক্ষেত্র ; এখানে একটি জৈন মন্দির আছে। কথিত হয় যে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের একাদশ অধস্তন সাধক অংশুনাথের সাধনভূমি এই সারনাথ—তাই তাঁর নামে এই মন্দিরটি ১৮২৪ খ্রীঃ নির্মিত হয়। হিন্দুধর্মের নিদর্শনও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি অসম্পূর্ণ বিরাট শিবের ত্রিশূল দ্বারা ত্রিপুরাসুর বধের মূর্তি ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে। উহা এখন সারনাথ মিউজিয়মের দক্ষিণপার্শ্বস্থ ঘরের পশ্চিম দেওয়ালে হেলান আছে। মূর্তিটি প্রায় ৭।৮ ফুট উচ্চ। সারনাথে মাত্র তিনটি অশোক স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রীষ্টিয় ৫ম শতাব্দীতে যখন ফাহিয়ান ভারতে আসেন তখন সারনাথে মাত্র ৪টি স্তূপ ও ২টি বিহার ছিল। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েনসাং এর আগমনকালে কিন্তু ঐস্থানে অসংখ্য স্তূপ ও বিহার নির্মিত হয়েছিল এবং অন্যূন ১৫০০ ভিক্ষু তথায় বাস

করতেন। তৎকালীন প্রধান মন্দিরে বুদ্ধের পূর্ণ অবয়বের একটি সুন্দর পিতলমূর্তি ছিল।

সারনাথের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি কিরূপে বিধ্বস্ত হলো তার আভাস পাওয়া যায়। খননকার্য্যের সময় একটি ক্ষুদ্র কক্ষ থেকে প্রচুর বুদ্ধমূর্তি একত্র পাওয়া গিয়েছে। ঐ মূর্তিগুলি অনুমান খ্রীঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর। যখন হূণদলপতি মিহিরকুল খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সমগ্র অনুগঙ্গ প্রদেশে তাঁর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করেন সেই সময় মূর্তিগুলিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য একটি ঘরের মধ্যে লুক্কায়িত রাখা হয়। গজনীর মামুদের নিষ্ঠুর অভিযানের সময়ও এ স্থান লুণ্ঠনের হাত থেকে নিস্তার পাইনি। বহু অত্যাচারীর অত্যাচারের পরের যা কিছু এখানে অবিকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট ছিল অনুমান ১১৯৪ খ্রীঃ মহাম্মদঘোরী তা নির্মূল করেন। আবিষ্কৃত মূর্তি ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ থেকে প্রচণ্ড লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহের নিদর্শন পাওয়া যায়।

ষ্টেশন থেকে সারনাথের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানের পথে প্রায় ১ মাইল উত্তরে বাম দিকে একটি স্তূপ প্রথমে দৃষ্ট হয়। উহার নাম "চৌখণ্ডী স্তূপ"। প্রকাণ্ড এক প্রাচীন ভগ্ন স্তূপের উপর পরবর্তীকালে নির্মিত এক অষ্টকোণ চূড়া বর্তমান। স্তূপটি ইষ্টকনির্মিত, মাটি থেকে মোট উচ্চতা ৮৪ ফুট। উক্ত অষ্টকোণ চূড়াটির উত্তর দ্বারস্থ পারসী শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সম্রাট আকবর তাঁর পিতা হুমায়ুনের ঐস্থানে আগমনের স্মৃতি-

রক্ষাকল্পে ১৫৮৮ খ্রীঃ উহা নির্মান করেন। উপর থেকে পার্শ্ব-বর্ত্তী অঞ্চলের দৃশ্য অতীত মনোরম। উত্তরে সারনাথের সুউচ্চ "ধামেক স্তূপ" ও নবনির্মিত বুদ্ধমন্দির এবং দক্ষিণে কাশীর আওরঙ্গজেবের আমলের ১৩০ ফুট চারিটি মিনার যুক্ত মসজিদ। উক্ত মসজিদটির ইতিহাস ঠিক জানতে পারিনি কিন্তু উহা 'বেণীমাধবের ধ্বজা' নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দু দেবতার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট এই মসজিদটির বিষয় জানবার জন্য দর্শকের মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। স্তূপটির নিম্নাংশ ১৯০৪-৫ খৃঃ খনন করা হয়। জেনারেল কানিংহাম ১৮৩৫ খৃঃ উহার শীর্ষদেশ থেকে তলদেশ পর্য্যন্ত কূপাকারে খনন করেন—যদি কোন প্রাচীন চিহ্ন পাওয়া যায় এই আশায়, কিন্তু কোন চিহ্নাদি পাওয়া যায়নি। হিউয়েনসাং এর বিবরণীতে আছে যে বুদ্ধ গয়া থেকে আগমন কালে যে স্থানে প্রথম ৫ জন ভক্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন সেখানে একটি ৩০০ ফুট উচ্চ স্তূপ ছিল। অনুমান করা হয় যে এইটিই হিউয়েনসাং বর্ণিত স্তূপ এবং অভগ্ন অবস্থায় ইহা ৩০০ ফুট না হলেও প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ ছিল।

তারপর সারনাথ মিউজিয়ম। যাদুঘর গৃহটি প্রস্তর নির্মিত, অনুমান ৬০০০ প্রাচীন আবিষ্কৃত জিনিষ রক্ষিত আছে; তার মধ্যে আছে প্রস্তরখোদিত মূর্তি, প্রাচীন রেলিং এর ভগ্নাবশেষ: পোড়ামাটির পাত্রাদি এবং শিলালিপি। ঐ সকল জিনিষের নির্মাণকাল ৩০০ খৃঃ পূঃ থেকে ১২০০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০০

বছর। মিউজিয়মের এক নম্বর ঘরে প্রথমেই চোখে পড়ে অশোক স্তম্ভের 'সিংহচূড়া'। উচ্চতায় ৭ ফুট, ৪টি প্রস্তরখোদিত সিংহমূর্ত্তি বিপরীতমুখী হয়ে বসে আছে। এটি প্রাচীন স্থপতি শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন। ঘরের উত্তরার্দ্ধে সূঙ্গ ও কুশান রাজত্ব-কালের (১৮০ খৃঃ পূঃ থেকে ২০০ খৃঃ) নির্মিত দ্রব্যাদি সঞ্চিত আছে।

তারপর প্রায় ৯।১০ ফুট উচ্চ লাল প্রস্তর নির্মিত একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহা বোধ হয় গৌতমবুদ্ধের বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্বে ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালের মূর্তি। মূর্ত্তিটির পশ্চাতে সমান উচ্চ একটি ছত্রদণ্ড। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি মূর্ত্তি দেখলাম, এটি প্রথম মূর্ত্তিটির অবিকল নকল— লাল চুনার পাথরে গঠিত, কেবল এই শেষোক্ত মূর্তির পদতলে একটি সিংহ আছে। বোধ হয় তাঁর শাক্যসিংহ নামের স্মরণে এটি নির্মিত হয়। পরবর্তী দ্রষ্টব্য "ধামেক স্তূপ"। উহা জৈনমন্দিরের উচ্চ চত্বর থেকে ১০৪ ফুট উহার ভিত্তি সমেত ১৪৩ ফুট উচ্চ ইষ্টক দ্বারা নিরেট গাঁথনি। উর্ধদেশের ইষ্টকগুলি গুপ্তযুগের ছাঁচে নির্মিত, সুতরাং স্তূপটিও ঐ যুগেরই। স্তূপটির আকৃতি দেখে মনে হয় যে উহা অসম্পূর্ণই রহিয়াছে। তারপর নবনির্মিত বুদ্ধ মন্দির। মন্দিরটির গঠনপ্রণালী এবং কারুকার্য্য দক্ষ শিল্পীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অভ্যন্তরে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তিটির প্রশান্ত ভাব স্বতঃই ভক্তির উদ্রেক করে।

—(*)—

সঙ্গীতের উৎপত্তি ও প্রচার

বৈদ্যনাথ দত্ত

জপকোটী গুণং ধ্যানং ধ্যানকোটী গুণং লয়ঃ।
লয়কোটী গুণং গানং গানাৎ পরতরং নাহি ॥

জপের কোটী গুণ ধ্যান, ধ্যানের কোটী গুণ লয়, লয়ের কোটী গুণ গান, গানের পর আর কিছুই নাই। সেই সঙ্গীতের উৎপত্তি দেবাদিদেব মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে হইয়াছে। তৎপরে কি প্রকারে সঙ্গীত বিদ্যা প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে নানা মত প্রচারিত আছে। ব্রহ্মা মহাদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভরত, নারদ, তম্বুরু, হুহু ও রম্ভা তাঁহার পাঁচ শিষ্য। তাঁহাদের দ্বারাই সমস্তলোকে সঙ্গীত প্রচারিত হয়। অন্যমতে নারদ, ভরত, কশ্যপ, কোহল এবং মতঙ্গ বিভিন্ন লোকে সঙ্গীত প্রচার করেন। সঙ্গীতের নিদর্শন বেদ. উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিৎস্বরসংযোগে সামগান গীত হইত। সাম শব্দের অর্থ গীত। ব্রহ্মা বেদ চতুষ্টয়ের সার সংগ্রহ করিয়া সঙ্গীতরূপ পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন।

পূর্ণঃ চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূ।
ইমংতু পঞ্চম বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়েৎ ॥
গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্চতে।

তবে এই তিনের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের স্থান প্রধান বলিয়াই সঙ্গীত শব্দে প্রধানতঃ কণ্ঠসঙ্গীতকেই বুঝাইয়া থাকে। সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ সঙ্গীতকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগের নাম কণ্ঠ-

সঙ্গীত অপর ভাগের নাম যন্ত্র সঙ্গীত। নাদই সঙ্গীতের মূল একাধিক বস্তুর সংঘাতে আকাশ হইতে নাদের উৎপত্তি হয়। নাদ দ্বিবিধ, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। দুই বস্তুর ঘাত প্রতিঘাতে যে নাদ উপস্থিত হয় তাহা ধ্বন্যাত্মক, আর মনুষ্যাদির কণ্ঠতালুর ঘাতপ্রতিঘাতে যে স্বরের উৎপত্তি হয় তাহা বর্ণাত্মক। ইহাই যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত। সোমেশ্বর, ভরত ও কল্লিনাথ এককালে সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের চারিজনের মত চারি প্রকারে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন সঙ্গীত শাস্ত্র প্রধানতঃ সাতভাগে বা সাত অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। সেই সাত অধ্যায়ের নাম—স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, নৃত্যাধ্যায়, তালাধ্যায়, ভাবাধ্যায়, কোকাধ্যায় ও হস্তাধ্যায়। এই সমস্ত অধ্যায় যে সব গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেই গ্রন্থসমূহ এখন লোপ প্রাপ্ত সুতরাং কিরূপ পদ্ধতিতে ঐ সকল গ্রন্থে উপর্য্যুল্লিখিত সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল তাহা এখন আর বুঝিবার উপায় নাই। ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে তাহার অধিকাংশই লোপ পাইতে বসিয়াছে। কয়েকজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত শাস্ত্রবিদের নাম এবং তাহাদের কৃত গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া হইল। এখনও এই গ্রন্থের দুইচারি খানা পাওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থকার :—	গ্রন্থ :—
শুভঙ্কর	সঙ্গীত দামোদর
শাঙ্গদেব	সঙ্গীত রত্নাকর
বীরনারায়ণ	সঙ্গীত নির্ণয়।
সিংহভূপাল	সঙ্গীত সুধাকর।

গ্রন্থকার :—	গ্রন্থ :—
হরিভট্ট	সঙ্গীত দর্পণ ও সঙ্গীতসার
দামোদর	সঙ্গীত পারিজাত।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সঙ্গীত দামোদর, সঙ্গীত দর্পণ, সঙ্গীত পারিজাত ও সঙ্গীত রত্নাকর প্রভৃতির নাম উল্লেখ অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদগণ নির্দেশ করেন সাতটি কারণে সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্তি জন্মিয়া থাকে। শরীর সঞ্চালন, নাদসম্ভূতি, তাল শ্রবণ, শুদ্ধসপ্তস্বর, বিকৃত দ্বাদশস্বর প্রভৃতি সঙ্গীত অনুরাগোৎপত্তির কারণ, শুদ্ধস্বর সাতটি। সেই সাতটি স্বরের নাম—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। এই সপ্তস্বর হইতে রাগরাগিনীর মূল সঋগমপধনি এই সাতটী স্বর গৃহিত হইয়াছে। এই সপ্তস্বরের উৎপত্তির মূল সপ্তবিধ জন্তুর কণ্ঠস্বর। তবে কোন জন্তুর ধ্বনি হইতে কোন স্বরগৃহিত হইয়াছে তদ্বিষয়েও মতান্তর আছে। এই সম্বন্ধে প্রধানতঃ প্রকাশ—ময়ুর, বৃষ, অজ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, কুঞ্জর ও অশ্ব এই সাত জন্তুর স্বর হইতে যথাক্রমে সঋগমপধনি এই সপ্তস্বর গৃহিত হইয়াছে। এই স্বর সংযোগের তারতম্যে প্রধানতঃ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর উৎপত্তি হয়। আবার সেই ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী হইতে অসংখ্য উপরাগ ও উপরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সঙ্গীত আলাপন সময়ে গোপিনীগণ যোড়শ সহস্র রাগের আলাপন করিয়াছিলেন। ছয়টী প্রধান রাগের নাম—ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘ। এই সকল রাগের নাম সম্বন্ধেও মতান্তর আছে। সোমেশ্বর ও কল্লিনাথ প্রভৃতির মতে শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ ও নটনারায়ণ। পূর্ব্বে সঋগমপধনি এই

সাতটী স্বরের কথা বলা হইয়াছে। সেই সপ্তস্বরের সমাবেশ পদ্ধতির পরিবর্তন অনুসারে এক এক রাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হনুমন্ত মতে ষড়রাগের মধ্যে দীপক রাগ দ্বিতীয় রাগ বলিয়া অভিহিত আছে। দেশী, কামোদী নাটীকা কেদারী ও কানাড়া এই রাগের আশ্রিতা বা পত্নী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই সকল রাগরাগিণীর আবার পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, সখা, সহচর প্রভৃতির বর্ণনা আছে। স্থূলভাবে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী ধরিয়া লইলেও তাহা হইতে যে কত রাগরাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন্ রস প্রকাশ করিতে হইলে কোন প্রকার স্বরের সাহায্য আবশ্যক সঙ্গীত শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূর্চ্ছনা, তান, গমক, তাল, মান প্রভৃতি সঙ্গীতের অঙ্গ বলিয়া পরিকির্তিত হইয়াছে। স্বর, শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা রাগ-রাগিণীর স্বরূপ তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ রাগ-রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গীত হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এ দেশে এক সময়ে সঙ্গীতবিদ্যার এতই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে এক এক রাগের শক্তিতে প্রকৃতির এক এক বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইত। সঙ্গীতশাস্ত্রে দেখা যায় দীপক রাগ আলাপ করিলে নির্ব্বাপিত দীপ শিখায় অনল সঞ্চার হইত, সঙ্গীত আলাপকারী সঙ্গীতোৎপন্ন অনলে দগ্ধ হইত। এইরূপ মেঘমল্লার রাগ আলাপ করিলে অনাবৃষ্টির সময়ও আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া বারিবর্ষণ হইত। ভৈরব রাগ আলাপনে উষার আবির্ভাব হইত। বসন্ত রাগ আলাপ করিলে নব বসন্তের আবির্ভাব অনুভূত হইত। শ্রীরাগের আলাপনে সন্ধ্যা সমাগম হইত। এইরূপ বিভিন্ন রাগ এবং রাগিণীর আলাপনে বিভিন্ন ঋতু এবং কালের আবির্ভাব দেখা যাইত সেই হেতু বিভিন্ন রাগরাগিণী বিভিন্ন

সময়ে আলাপন করিবার প্রথা সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যথা—হেমন্তে সভার্য্যক নটনারায়ন, শিশিরে সস্ত্রীক শ্রীরাগ, বসন্তে, সপত্নীক বসন্ত, গ্রীষ্মে সভার্য্য ভৈরব, শরতে সস্ত্রীক পঞ্চম বা দীপক এবং বর্ষায় সাদর মেঘরাগ আলাপনের ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান সময়ে আর সেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। আকবর শাহের সময়ে সঙ্গীতের পূর্ণ বিকাশ হয়। সেই সময় খেয়াল গানের সৃষ্টি হয়। আমির খসরু এই খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন।

তালাধ্যায় :—

তালের সঙ্গে সুরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুর যেমন নানা রাগরাগিনীতে বিভক্ত তালও তেমনি নানা প্রকার ভেদে গঠিত। কথিত আছে হরপার্ব্বতীর নৃত্যকালে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের আদ্যাক্ষরদ্বয় লইয়া তাল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাল শব্দে রাগের গতি ও বিরাম স্থান বুঝায়। বিভিন্ন গতির বিভিন্ন তাল আছে। কতকগুলি মাত্রার সমষ্টিকে তাল বলে। তালের ও সুরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে কাল পরিমাণ বুঝা দরকার। কাল পরিমাণ বুঝিয়া সম, বিষম অতীত অনাঘাত প্রভৃতি তালের অঙ্গের বিষয় অনুধাবন করা আবশ্যক। সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনশতষাটের অধিক তালের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে নিম্নে প্রদত্ত কয়েকটির প্রচলন ইদানীং আছে। যথা—চৌতাল, সুরফাক্তা, ধামার, রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা, একতালা, তেতালা প্রভৃতি। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সঙ্গীত দুই প্রকার—কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত। যন্ত্রসঙ্গীতেরই অপর নাম বাদ্য। এই বাদ্য সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহকে শাস্ত্রকারগণ প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

সেই চারি শ্রেণীর নাম শুষির, ঘন, আণদ্ধ ও তত। যে যন্ত্রের মধ্যে ছিদ্র আছে তাহাই শুষির পর্য্যায়ভুক্ত যথা—মুরলী, তুরী, ভেঁড়ী ইত্যাদি। মন্দিরা, করতাল প্রভৃতি ধাতব প্রস্তুত যন্ত্রগুলি ঘনপর্য্যায় অন্তর্গত। তার সংযুক্ত যন্ত্রাদি যথা—বীণা, তানপুরা, রবাব, সারেঙ্গী প্রভৃতি তত সংজ্ঞাভুক্ত। চর্ম্মনির্ম্মিত যন্ত্রাদি যথা—মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোল ইত্যাদি আনদ্ধ পর্য্যায়ভুক্ত। ইহার মধ্যে কোন যন্ত্র কখন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিলে সঙ্গীতচর্চ্চায় ভারতবর্ষের আদিমত্ব প্রমাণিত হয়। মৃদঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে দেবাসুর যুদ্ধের সময় ত্রিপুরাসুর বধ হইলে দেবগণ নৃত্য আরম্ভ করেন নটরাজ স্বয়ং এই নৃত্যের নায়করূপে যোগদান করেন। ব্রহ্মা সেই সময় ত্রিপুরাসুরের রক্তে সিক্ত মৃত্তিকা দ্বারা মৃদঙ্গ প্রস্তুত করিয়া বাদন করেন। অধুনা ব্যবহৃত মৃদঙ্গের বর্ণ রক্তিম; সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে কত সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

"বন্দেমাতরম"

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ

ভূপেন্দ্রনাথ সরকার

উপমাচ্ছলে কবিদের সহিত স্বর্গের পাখীর তুলনা করা হইয়াছে। স্বর্গের পাখী সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি এই যে উহারা পদবিহীন; সুতরাং সাধারণের বিশ্বাস, কবিরাও পদবিহীন—অর্থাৎ এ ধরার ধূলি তাঁহাদের পদপ্রক্ষেপের অনুপযুক্ত। তাঁহাদের মতে কবির কার্য্য হইতেছে তাঁহার কল্পনাশক্তির সহায়তায় কবিতার অবতারণা করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধারণের এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন; তিনি তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা দেখাইয়াছেন, কবিরা যে কেবলমাত্র কল্পনার পাখায় ভর করিয়া সাধারণের অনধিগম্য স্থানে বিচরণ করেন, তাহা নহে, সময়বিশেষে তাঁহারা আপামর জনসাধারণের ন্যায় এ পৃথিবীকেও তাঁহাদের পদধূলি-দানে পীঠস্থান করিয়া তুলেন। ধরার ধূলিতে কবিগুরুর পদ-ক্ষেপের ফলে শান্তিনিকেতনের সৃষ্টি। কবি নিজে মুখে বলিয়াছেন,—"বিশ্বভারতী এমন একখানি তরী যাহা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অন্যতম মূর্ত্ত রূপ—তাঁহার শান্তি-নিকেতন বা বিশ্বভারতী! দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি তাঁহার

ভাল লাগে নাই, নিজ ছাত্রজীবনের বিষাদময় অভিজ্ঞতা তাঁহাকে ইহার বিদ্রোহী করিয়াছে। তাঁহার মনের এই বিদ্রোহী ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার অনবদ্য সৃষ্টি শান্তিনিকেতনে।

এই বিদ্যায়তনে অভিনব উপায়ে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ শিশুমনকে বাঁধাধরার কঠিন বন্ধন হইতে, নিয়মরক্ষার ভয় হইতে এবং শিক্ষকের পীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে প্রকৃতির সাহচর্য্যে বিচরণ করিবার সুযোগ দিয়া প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির বহু কুফল হইতে শিশুদিগকে সযত্নে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পক্ষে প্রকৃতি যে তাহাদের এক প্রধান সহায়, রবীন্দ্রনাথ ইহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যের স্কুল 'বেঙ্গল একাডেমি' সম্বন্ধে বলিতেছেন, "ইহার ঘরগুলি নির্ম্মম, ইহার দেওয়ালগুলা পাহারা-ওয়ালার মতো—ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই ইহা খোপ-ওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। ছেলেদের যে ভালোমন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্ব্বাসিত।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই সুপ্রাচীন 'আশ্রম' ও 'তপোবন'কে তাঁহার শিক্ষায়তনের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্য প্রকৃতির সহিত যোগ-সূত্র অপরিহার্য্য। মুক্ত বাতাসে, ছায়াচ্ছন্ন আম্রবৃক্ষতলে প্রাচীন

ঋষিদের ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রশান্তবদন রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপনা আমাদের মনে ভারতের এক গৌরবময় বিস্মৃতপ্রায় যুগের কথা মনে করাইয়া দেয়। তাঁহার মতে শিক্ষক হইবেন একাধারে শিক্ষার্থীর বন্ধু এবং উপদেষ্টা। অধ্যাপনার সময় শিশুমনের গতির সহিত শিক্ষকের নিজমনের গতির সংযোগসাধন করিতে হইবে। শিক্ষাদান কার্য্যটা যে একটা প্রাণবন্ত জিনিষ উহা যে যান্ত্রিকভাবে সুসম্পন্ন হয় না—এ কথা যেন সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণপথে থাকে। এই কথা স্মরণে রাখিয়াই বোধ হয় কবিগুরু তাঁহার ছাত্রছাত্রীর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হন, অভিনয়ে ভূমিকা-গ্রহণ করেন এবং নৃত্যে যোগদান করেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রতিদিন যখন আশ্রমবাসীগণ নিম্নলিখিত গান গায়, তখন আশ্রম এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মুখরিত হয়।

"আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হ'তে আপন॥
তার আকাশ ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥"

এখানে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় এবং সেই জন্যই বিদ্যালয়ের সহিত কলাবিদ্যার, সঙ্গীতের, জাতীয় উৎসবের এবং আমোদ প্রমোদের অবতারণা করা হইয়াছে—শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, জীবনের প্রতি—

দিকের, প্রতি অংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। প্রকৃতির সহিত শান্তিনিকেতনের প্রাণ যে একসূত্রে গ্রথিত, ইহা প্রমাণিত হয় শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসবগুলির দ্বারা। বিভিন্ন ঋতুর আগমনে যে বৈচিত্র্যময় নব নব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। এক একটা ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত শিশুর হৃদয়ও স্পন্দিত হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী যে আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, কেননা তিনি তাঁহার শিক্ষায়তন হইতে শাস্তিপ্রদানের বর্ব্বরপ্রথা তুলিয়া দিয়া এবং নিপুণ শিল্পীর ন্যায় শিশুমনের সম্মুখে চিরবৈচিত্র্যময় প্রকৃতির রূপ উপস্থাপিত করিয়া উহাকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া দেবায়তনে পরিণত করিয়াছেন।

মাতৃভাষা যে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, শিক্ষাকে আমাদের নিজস্ব করিয়া তুলিবার প্রকৃত উপায়—মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান বিতরণ করা। মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য্য, সেইরূপ শিশুর জ্ঞানান্বেষণে মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদান অত্যাবশ্যক। শান্তি-নিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের 'পাঠ' যদিও কম নহে, তথাপি রন্ধন, উদ্যান রচনা, কাপড় বোনা, ছবি আঁকা ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যের সংমিশ্রণে তাহা কখনো কষ্টসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তথায় পাঠকে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্ত্তব্যরূপে না ধরিয়া একটা অংশরূপে গণ্য করা হইয়াছে; ফলে এই পড়ার প্রবৃত্তিটি অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। Scouting বা ব্রতীবালকদলের

কাজ, সমবায় ভাণ্ডারের কাজ ইত্যাদি করিবার ফলে তাহাদের মনে একত্রে কাজ করিবার সুফলগুলি বদ্ধমূল হইয়া যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবির নিজের ভাষায় বলে,—"আমি বরাবর বলে এসেচি শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না।" বিশ্বভারতীকে তিনি প্রাচীন ভারতের শিক্ষাজগতের মুকুটমনি নালন্দার অনুরূপে পরিকল্পিত করিয়াছেন। তাঁহার এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে দেশবিদেশ হইতে মনীষিবৃন্দ তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে যোগদান করিয়া উহাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার ছাত্রছাত্র বিদ্যালয়গুলির ন্যায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীগণকে স্বাবলম্বন এবং শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দেওয়া হয়। নিজেদের সকল কাজ তাহাদের নিজেদেরই করিতে হয়। বৎসরে অন্ততঃ একদিন তাহাদের ডোবা, খানা ও ময়লা পরিষ্কার করিতে হয় সেই দিনটির নাম "গান্ধী-দিবস"।

শান্তিনিকেতন যে ভারতের শুধু গর্ব্বের বস্তু তাহা নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বের এক বহুমূল্য সম্পদ। শান্তিনিকেতন বিশ্বের সম্মুখে কবির মনের অন্য এক দিক আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল করিবে; তিনি শিশুকে কত ভালবাসিতেন এবং তাহাদিগের শিক্ষা মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহার মূর্ত্ত প্রয়াস চিরতরে বিরাজমান থাকিয়া শিক্ষাগুরুর যশঃগাথা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নিকট প্রচার করিবে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইতিকথা

মোহনকালী বিশ্বাস

প্রয়োজনের তাগিদে এবং অভিলাষ চরিতার্থের জন্য মানুষ গড়েছে বিজ্ঞানকে। কোন অতীত যুগে গুহা-মানব প্রথম তার পাথরের অস্ত্রকে শানিত ক'রে নিয়ে কার্য্যোদ্ধার করেছে। কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, জ্বেলেছে আগুন, তা আমরা জানিনা, কিন্তু সেইদিন থেকেই মানুষের বিজ্ঞানসাধনার সূত্রপাত; এই বিজ্ঞান বিভিন্নদেশে বিভিন্নযুগে বিভিন্নভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। যে সব প্রাচীন সভ্য দেশে এর চর্চ্চা হয়েছিল তার মধ্যে ভারতের কথা ছেড়ে দিলে প্রথমেই মনে পড়ে চীন, ব্যাবিলন ও মিশর দেশের কথা। যিশুখৃষ্ট জন্মাবার দু'হাজার বছরের আগে থেকে ব্যাবিলন আর মিশরের মাটীতে বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বিজ্ঞান সেখানে প্রকাশ পেল সময় ও দূরত্ব মাপবার মধ্যে দিয়ে; সামান্য কিছু জ্যামিতি, জ্যোতির্ব্বিদ্যাও তারা জানত। তারপর এদের পঞ্জিকা সৃষ্টি করতে হ'লএবং এই রকম করেই দিন, মাস বছরের সৃষ্টি হ'ল। আর একদিকে অসুখ-বিসুখ মানুষকে চিরকাল জ্বালিয়ে এসেছে। তাই এই ব্যাধিগুলিকে দূর করবার পন্থা যখন বিজ্ঞান আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে, তখন এরা ঔষধবিদ্যাকে সমাদর না ক'রে পারল না। বিজ্ঞান হাতে

হাতে জোগাড় দিতে লাগল ঔষধ তৈয়ারীর কাজে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাবিলনিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এটা খাপ খেল না—তারা জানত যে, অসুখবিসুখ ইত্যাদির ওপর ভগবানের হাত আছে ষোলআনা এবং এর সমস্যা দূর করতে তারা যাদুবিদ্যা ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ ক'রল। কিন্তু মিশরে এই ঔষধবিদ্যার উন্নতি দেখা দিল বিশেষভাবে।

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী গড়িয়ে গেল—বিজ্ঞানে বিপুল কর্ম্মক্ষমতা দেখা দিল গ্রীসের ভূমিতে। এইরূপে বিজ্ঞানে ভাগ্য রবির দেখা মিলল এবং এর মূলে ছিল অদ্ভুত, কৌতুহলী গ্রীস-জাতি।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রথম স্ফূর্ত্তি হ'য়ে উঠ্ল গ্রীসদেশে। অঙ্ক-শাস্ত্রের উন্মেষ গ্রীসে প্রথম পাইথাগোরাস্ কর্ত্তৃক হ'লেও গ্রীসের ঢের আগে ১, ২, ৩ ইত্যাদি রাশিমালা ভারতবাসীরই উর্ব্বর মস্তিষ্কে সাজিয়েছিল এবং এদের মধ্যে প্রথম যাঁর দেখা মিলেছিল, তিনিইহলেন মহাপুরুষ আর্য্যভট্ট, যাঁর দেশ ছিল পাটনা। এই রাশিমালা সংখ্যাতত্ত্ব ও বীজগণিত আরবদের ওপর ভর ক'রে ভারতের পূণ্যভূমি থেকে ইউরোপের মধ্যে পরবর্ত্তীযুগে প্রবেশ করেছিল।

পরবর্ত্তীকালে নিউটনও যেদিন প্রকৃতিদেবীকে অঙ্কশাস্ত্রের কাঠামোর মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করলেন সেদিন তিনি এক অসীম সাহসিকতার কাজ করলেন। তারপর এল বিজ্ঞানের ইতিহাসে রোমানরা। শনিগ্রহের মত শিশুবিজ্ঞানকে হুম্‌কির তাড়ায় সে

ঝিমিয়ে দিল । বিজ্ঞানের প্রাণের স্পন্দন থেমে আসতে লাগল। রোমানরা বিজ্ঞানের শুধু ব্যবহারিকজীবনের প্রয়োজনীয়তাটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। অন্যদিকে তাদের নজর পৌঁছায়নি। তারপর থেকে চলল এক অন্ধকার যুগ। তারপর রেনেঁসা এল। দিকে দিকে পুঁথিঝাড়ার শব্দ আরম্ভ হ'ল—কিন্তু তাদের মন ছিল অন্যদিকে নিবদ্ধ। বিজ্ঞান তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। তাই তারা—একে অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে করল। তাদের প্রশ্নের বিষয় ছিল, কেন বা মানুষ জন্মেছে, কেনই বা পৃথিবীর সৃষ্টি হ'ল। তারা কখনও ভাবতে শেখেনি কেমন ক'রে এ সব ঘটল, কি পন্থায়, কি পদ্ধতি ধ'রে? কিন্তু যাই হোক এই নৈয়ায়িক মতটা যদিও বিজ্ঞানকে দাবিয়ে দিয়েছিল, তবু তার পরিপন্থী সে হয়নি। ব্যাবিলনিয়ানরা ভাবত জগত চলেছে ঐশী খেয়ালের সঙ্কেতে কিন্তু মিডিভ্যালিস্টরা বললেন যে প্রকৃতিদেবী খামখেয়ালী নন. তিনি মানবোচিত যুক্তির পথ ধ'রেই চলেন এবং এই মতের পাখার ওপর ভর ক'রে ঝিমিয়েপড়া মেরুদণ্ডভাঙা বিজ্ঞান আবার নীল আকাশের দিকে দ্রুত বেগে উড়ে চলল। হোয়াইটহেড্ বললেন যে প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে এবং কার্য্যের সঙ্গে কারণের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে এবং এই মতটির উপরই আজ বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে। যাক্ এতদূর পর্য্যন্ত বিজ্ঞান এগিয়ে এল এই ব'লে যে প্রকৃতিদেবী মানবোচিত যুক্তির পথ ধ'রেই চিরকাল চলেছে এবং এই বৈজ্ঞানিক ধারণাটা পরিষ্কার এবং সুষ্ঠুভাবে

প্রথম প্রকাশ পেল গ্যালিলিওর দ্বারা। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রথম যাকে দেখা গিয়েছিল তিনি রেনেঁসা যুগের বিজ্ঞানবীর লিওনার্ডোডাভিনসি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাঁর জ্যোতি নিয়ে ফুটে উঠ্‌তে পারলেন না। তারপর বিজ্ঞানের রঙ্গভূমিতে দেখা গেল কোপারনিকাশকে। কোপারনিকাশ বললেন পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহাদি সূর্য্যদেবের চারিপাশে ভ্রমণ করে—এতে টোলেমির মত যে 'পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য গ্রহাদি ঘুরছে', সেটা উল্‌টে গেল। কোপারনিকাশ কিন্তু গ্যালিলিওর মতন বিজ্ঞানপ্রাণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। তখনকার দিনের লোকেরা এদিকে বাইবেলকে অন্ধের মত অনুসরণ করত এবং এই বাইবেলের বিপক্ষে যাওয়া তাদের পক্ষে ছিল দু'সাহসের কার্য্য।

তারপরে এলেন গ্যালিলিও আর কেপ্‌লার বিজ্ঞান আকাশে নূতন জ্যোতিষ্কের ন্যায়। গ্যালিলিও কিন্তু একজন 'হাড়ে হাড়ে' বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। কারণ তিনি ম্যাথামেটিক্যাল্ ডিডাকসনের প্রয়োজনীয়তা তেমন উপলব্ধি করতে পারেন নি। কেপলার ছিলেন বিজ্ঞান জগতের কবি। তিনি বলেছিলেন যে পার্থিব যা কিছু, তাদের মধ্যে একটা আঙ্কিক সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধটা খুঁজে বার করতে পারলে বোধ হয় বিশ্বনির্ম্মাণকর্ত্তার অভিপ্রায়টা বোঝার সৌভাগ্য আমাদের হ'তে পারত।

তারপর হ'ল আইজাক নিউটনের অভ্যুদয় এবং এই সর্ব্বাঙ্গীন-

সুন্দর জ্বলজ্বলে জ্যোতিষ্কেরা আলোকচ্ছটায় গ্যালিলিও ও কেপলার গেলেন যেন কোন অতল তলে তলিয়ে। নিউটনের সময় বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার হাবভাব সব গেল বদ্‌লে। নিউটন ঘোষণা করলেন বিজ্ঞানের ভিত্তি সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপরে। দুঃখের বিষয় নিউটনের সময়ের লোকেরা তাঁর কদর বুঝল না—যদিও তাঁরই প্রভাবে পরবর্ত্তীকালে যান্ত্রিক বিজ্ঞানের বিজয়দুন্দুভি বেজে উঠেছিল।

এর পর এল যান্ত্রিক বিজ্ঞানের যুগ। বিশ্ব ব্যাপারকে একটি যন্ত্রের মতন কল্পনা ক'রে নেওয়া হ'ল এবং প্রকৃতির লীলাখেলার প্রত্যেক ঘটনা ব্যাপারের মধ্যে যান্ত্রিকগুণ আরোপ করা হ'ল। কিন্তু এ মত বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারল না। এও ভেঙ্গে পড়ল আধুনিকতম বিজ্ঞানের সংঘাতে। এ যুগের দিক্‌পাল হ'লেন আইনষ্টাইন। এ সময় একটি সমস্যা এসে পড়ল, সেটা হচ্ছে অঙ্কের সমস্যা। কিন্তু আইনষ্টাইন তাঁর অদ্ভুত প্রতিভাবলে সকল সমস্যা পরিষ্কার ক'রে দিলেন। এই নবযুগের শেষে বিজ্ঞান যে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, সেটা একটা ভাব্‌বার বিষয় হ'য়ে পড়েছে। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বিজ্ঞানজগতে যে আত্মবিশ্বাসটা দেখা গিয়েছিল, সেই আত্ম-বিশ্বাসটা আজ দূর্ব্বল, ভগ্নপ্রায় হ'য়ে পড়েছে—বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে যে সকলের মনে ধোঁকা লাগিয়ে দিচ্ছে যে সত্যি কি আমরা এগোচ্ছি না পেছোচ্ছি ?

জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ

মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কল্পনার মায়ায় ললিত সৌন্দর্য্যের ছবি এঁকে,—দুরূহ তত্ত্বালোচনা ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হন্ নি—তিনি ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক। জাতির পঙ্গু জীবনকে শত আঘাতে চেতনাশীল করবার ব্রতও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। দেশ তাঁর চোখে অখণ্ড মূর্ত্তিরূপে দেখা দিয়েছিল—সমস্ত দোষগুণশুদ্ধই তিনি দেশকে ভালবেসেছিলেন। চিরদিনই দেশের আকাশ বাতাস তাঁর প্রাণে বাঁশি বাজিয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে—দেশের 'অবারিত মাঠ গগন ললাট' তার চোখে মায়ার সৃষ্টি করেছে—আত্মহারা কবি বঙ্গজননীর স্তবগান করেছেন।

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই তাঁকে মুগ্ধ করেনি ভারতের আধ্যাত্মিক মূলমন্ত্রটিও তাঁকে বিস্মিত করেছিল—প্রাচীন ভারতের রীতি নীতি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি বুঝেছিলেন এর সার্থকতা, তাই জগতের সামনে তিনি ধ'রে দিয়েছেন তাঁর জাতির আদর্শ—সে আদর্শ ভোগের নয় ত্যাগের। রাষ্ট্রীয় উন্নতি ভারতের আদর্শ নয়—এদের ভোগের মধ্যে ত্যাগের সাধনা তাঁর কাছে শ্রেষ্টত্ব লাভ করেছে,

> "শিখায়েছে স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব সুখে দুঃখে,
> সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

সহরের কোলাহলমুখর চঞ্চলতা এরা চায়নি—চেয়েছিল তপোবনের

শান্তিময় নির্জনতা। বিংশ শতাব্দীর ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয় আদর্শকেই শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রার্থনা ক'রে বলেছেন,—"দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর"। এই জাতীয় ভাবকেই তিনি মনেপ্রাণে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছেন —এ দিয়েছে তাঁর হৃদয়ে এক গভীর অনুপ্রেরণা—এর মধ্যে তিনি এক মঙ্গলময় শান্তির সন্ধান পেয়েছেন, এই তপোবনের সভ্যতার কাছে চিরঅশান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁর চোখে ছোট হ'য়ে গেছে। এই ঋজু সভ্যতার দিকে দেশবাসীর চিত্ত আকৃষ্ট করতে তিনি চেষ্টা করেছেন —তিনি তার দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ভিক্ষায় কেউ কোনদিন বড় হতে পারে না—'আমাদের সামনে এত বড় আদর্শ থাকতে কেন আমরা পরের কাছে হাত পাতব? দেশের অনুকরণপ্রিয়তাকে লক্ষ্য ক'রে ব্যথিত চিত্তে তাদের আঘাত দিতে অম্লান স্বদেশপ্রেম তাঁকে বাধ্য করেছিল—তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে তিনি বলেছেন—'পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস"? এ কটাক্ষ বিদ্বেষপ্রসূত নয়— স্নেহের উপদেশ। এই পূজারীভক্ত স্বদেশের পূজাতেই আত্মনিয়োগ করেছেন—স্বদেশলক্ষ্মীর অক্ষয় সম্পদের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাই সমগ্র জাতির প্রতীকরূপে তিনি প্রার্থনা করলেন—

"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছ গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি বচন
তাই আমাদের দিয়ো—
পরের সজ্জা ফেলিয়া পড়িব
তোমার উত্তরীয়"।

"দারিদ্রের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য' ভারতবর্ষের আছে তা' তাঁকে মুগ্ধ করেছে—তিনি তাঁর কাব্যে, সংগীতে, ব্যক্তিগত জীবনে এই স্বাদেশিকতার মর্ম্মকথা প্রকাশ করেছেন। "নৈবেদ্য" কাব্যে আমরা তাঁর স্বাদেশিকতার এক পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পাই।

দেশমাতৃকাকে তিনি প্রাণের সঙ্গে ভালবেসেছিলেন. দেশের পুরাতন আদর্শ তাঁকে মুগ্ধ করলেও—বর্ত্তমান দুর্নীতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি—অন্যায় দুর্ব্বলতাকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দিতে পারেন নি, মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই তাঁর আদর্শ, যেখানে এ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেখানে স্বদেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে তাকে মেনে নিতে তাঁর বিশ্বমন সাড়া দেয়নি—তিনি তীব্র কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন—সে প্রতিবাদ বিদেশীর শোষণনীতির বিরুদ্ধেও যেমন, স্বদেশের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেও তেমনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি অন্যায়কারীকে আঘাত করেছেন—

> মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে,
> ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

স্বদেশের এই গ্লানিকে তিনি স্বীকার করেছেন কিন্তু মেনে নিতে পারেন নি—সমগ্রতার উপাসক কবি মহামানবের মিলনক্ষেত্র ভারতের সাগরতীরে শাশ্বত মানবতার অভিষেক সম্পন্ন করবার জন্য জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের মানবত্বাকে আহ্বান করেছেন—তাঁর কাছে মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ হিন্দু মুসলমান নয়, ইংরাজ বাঙ্গালী নয়, তিনি জানেন "জগত জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতি মানব জাতি" জীবনে এই অখণ্ড পরিপূর্ণতার প্রার্থনায়

তিনি স্বদেশের জন্যে করেছেন। দেশের "ত্রাণ" জন্য তার মুক্তির জন্য তাঁর প্রার্থনা কি গভীর দেশপ্রেমের নিদর্শন—শত সহস্র ভয়ে ভীত, শাস্ত্রাচার সংস্কারের সূতাতন্তুবদ্ধ আমাদের এই রুগ্ন মনের তিনি মুক্তি কামনা করেছেন—

"…………মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে"

'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা ক'রে, শিক্ষা সম্বন্ধে অজস্র প্রবন্ধ লিখে—স্বজাতির সামনে ধ'রে দিয়েছেন শিক্ষার প্রশস্ত পথ—শত শত বৎসরের অনাদর উপেক্ষায় যে জাতি জীবনকে ভালবাসা দূরে থাক, নিজেদের অধিকার মানুষ হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিল সেই জাতির সামনে ধ'রে দিলেন শাশ্বত জ্ঞানের আলোক, পুরাতনকে নূতনের উপযোগী করে আমাদের হাতে তুলে দিলেন, অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের কানে ধ্বনিত ক'রে দিলেন জাগরণের বাণী, পুরাতন সত্য নূতন সাজে বলিষ্ঠ হ'য়ে দেখা দিল। রুশো ভল্টেয়ারের মত তিনি নূতন যুগের সূচনা ক'রে দিলেন। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তা বিশ্বপ্রেমের বিরোধী নয়—বিশ্বপ্রেমের রূপান্তর মাত্র। সর্ব্বকালের সর্ব্বজাতির—বিশ্ব-মানবকে বঞ্চিত ক'রে, তাদের মানবত্বাকে অস্বীকার ক'রে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মানুষের প্রতিষ্ঠা চাননি—তাঁর গান বিশ্বের গান—তাঁর বিশ্বজনীন প্রেম শুধু নিপীড়িত ভারতবর্ষকে সিক্ত ক'রে ক্ষান্ত হয়নি বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত দুর্ভাগাদের উদ্দেশ্যে তাঁর করুণাধারা ছুটে চলেছে।

বিশ্বের সমস্ত অত্যাচার প্রপীড়িতের উদ্দেশ্যে তিনি গেয়েছেন :—

"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।"

এই জাগ্রত চিত্তকে দেশের কাজে আহ্বান করেছেন দেশ সেবার দুর্গম পথ ভাঙনের মন্ত্রই তিনি তাদের কানে দেননি, শুধু বিদ্রোহের গানই তিনি গাননি—চলার মন্ত্রও তিনি দিয়েছেন "আগে চল, আগে চল, আগে চল, ভাই'। আজ আমাদের প্রাণে জেগেছে দেশাত্ম-বোধ। কবির আহ্বানে সমস্ত তুচ্ছ ভয়, গ্লানি, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা দূর ক'রে জীবন অর্ঘ্য নিয়ে এই মাহেন্দ্রক্ষণে দেশজননীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে—জাতীয় জীবনের যুগসন্ধিক্ষণে কবি আমাদের কানে অভয় মন্ত্র দিয়েছেন—

"ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"
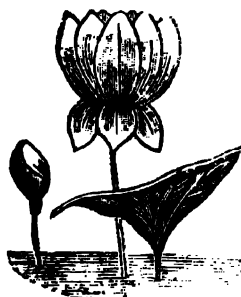
তিনের আত্মশ্রাদ্ধ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১। ত্রিলোচন, ত্রিনয়না—যাঁহার তিনটী লোচন আছে যথা মহাদেব, দুর্গা। ২। ত্রিবেদী—যাঁহার তিন বেদে অধিকার তিনিই ত্রিবেদী ; ৩। কাল—বর্ত্তমান, ভূত ভবিষ্যৎ। ৪। ভুবন—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল। ৫। দিবাভাগ—প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল। ৬। জীবন ধারণের প্রধান দ্রব্য—জল, বায়ু, আলো। ৭। ধর্ম্ম—জীবে দয়া, সদা সত্য কথা, নিঃস্বার্থে পরোপকার। ৮। প্রধান দেবতা—সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, বিনাশকর্ত্তা। ৯। ব্রাহ্মণ—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক। ১০। দৃষ্টি—সূক্ষ্মদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, সাধারণদৃষ্টি ১১। কুরস—কটু, তিক্ত, কষায়। ১২। হিংস্র জীব—শৃঙ্গী, নখী, দন্তী। ১৩। অবিশ্বাসী—স্ত্রীলোক, নদী, রাজকর্ম্মচারী। ১৪। স্ত্রীলোকের অবস্থা—কুমারী, সধবা, বিধবা। ১৫। পৃথিবী তিনে ধন্যা—গো, কৃষি, বন্যা। ১৬। নাড়ী—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ১৭। সুষুম্না নাড়ী—চিত্রীনী, বজ্রিনী, ব্রহ্মনাড়ী। ১৮ জীবশরীর—স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর, কারণশরীর। ১৯। ত্রিবেণী—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলনস্থান ২০। যুক্ত ত্রিবেণী—উদারা, মুদারা, তারা। ২১। আত্মার অবস্থা—নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। ২২। আত্মার কাল—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। ২৩। গুরু প্রধানতঃ—পিতামাতা, শিক্ষাদাতা, দীক্ষাদাতা। ২৪। তান্ত্রিক আচমন মন্ত্র—আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ২৫। পূজার ধ্যান—স্থূল, সূক্ষ্ম, জ্যোতির্ধ্যান। ২৬। পূজার বাদ্য—

শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর। ২৭। পূজা পদ্ধতি—পঞ্চোপচার, দশমোপচার, ষোড়শোপচার। ২৮। জপবিধি—বাচনিক, মানসিক, উপাংশু। ২৯। 'ওঁ' কার—৩ অক্ষরের মিলন। 'অ' অর্থাৎ বিরাট বিশ্ব বা অগ্নি 'উ' কার হিরণ্য গর্ভ বায়ু, 'ম' অর্থাৎ ঈশ্বর। ৩০। গায়ত্রীর ধ্যান—তিন বেলায় ৩টী পৃথক ধ্যান আছে। ৩১। ত্রিধারা (গঙ্গা)—১ম ধারা স্বর্গে, ২য় ধারা মর্ত্তে, ৩য় ধারা পাতালে প্রবাহিত। ৩২। ত্রিদণ্ড—বাক্‌দণ্ড, মনদণ্ড, কায়দণ্ড। ৩৩। ত্রিকর্ম্ম—দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন। ৩৪। ত্রিতন্ত্রী-সেতার, ইহার ৩টি তার আছে বলিয়া ইহার নাম ত্রিতন্ত্রী। ৩৫। ত্রিকটু—শুঁট, পিঁপুল, মরীচ। ৩৬। অমৃতের স্থান—দুধ, গুড়, টাকার সুদ। ৩৭। মিষ্টতার স্থান—মধু, গুড়, চিনি। ৩৮। প্রধান শত্রু—কাম, ক্রোধ, লোভ। ৩৯। দেওয়ানী বিচারক—মুনসেফ, সবজজ, জজ। ৪০। ফৌজদারী বিচারক—ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা হাকিম। ৪১। শ্রাদ্ধ—আদ্য, মাসিক, বাৎসরিক। ৪২। দানের বিচার—দেশ, কাল, পাত্র। ৪৩। মনুষ্যের ভাগ্যলিপি—জন্ম মৃত্যু, বিবাহ। ৪৪। সংসার—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। ৪৫। ত্র্যহস্পর্শ—তিন তিথির মিলন। ৪৬ উৎকৃষ্ট অন্ন—পেচরান্ন, পলান্ন (পোলাও), পায়সান্ন। ৪৭। দধি—শুকো, খাসা, চলন। ৪৮। নারিকেলের অবস্থা—ডাব, দোমালা, ঝুনো। ৪৯। কুল—পিতৃকুল, মাতৃকুল শ্বশুর-কুল। ৫০। দায়—পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়। ৫১। তেমাথা—তিনটি পথের মিলন। অতি বৃদ্ধ দুই হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকে বলিয়া উহাকেও তেমাথা বলে। ৫২। ত্রিফলা—হরিতকী, আমলকী, বয়রা। ৫৩। ত্রিজাতক—জৈত্রী, এলাচ, তেজপাতা। ৫৪। চা এর উপকরণ—জল, দুধ, চিনি। ৫৫। অল্প পয়সার নেশা—গাঁজা, গুলি,

চরস। ৫৬। চরসের সাঙ্কেতিক নাম—ছোট তামাক, পোষ্ট কার্ড, ৪৮. ৫৭। গুলি—বন্দুকের, নেশার, কবিরাজের। ৫৮. আলস্য পূর্ণ ক্রীড়া—তাস, দাবা, পাশা। ৫৯। ভূত—ভূত, প্রেত, পিশাচ ৬০। রাক্ষস—দক্ষ, দানব, রাক্ষস। ৬১। জুতা—সু, বুট. চটি বা স্যাণ্ডেল। ৬২। ঘড়ি—ক্লক. টাইমপীস, ওয়াচ। ৬৩। শাক্তদিগের বলি—ছাগ, মেষ, মহিষ। ৬৪। বৈষ্ণবদিগের বলি—নামাবলি, পদ-বলি, দোঁহাবলি। ৬৫। প্রধান গুণ—ক্ষমা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা। ৬৬। বেদান্তের অংশ—দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ. বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৬৭। বুদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র—বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি। ধম্মং স্মরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং স্মরণং গচ্ছামি ৬৮। ঘড়ির কাঁটা—ঘণ্টা, মিনিট সেকেণ্ড। ৬৯। জলের অবস্থা—কঠিন, তরল. বাষ্প। ৭০। পক্ষ—দ্বিপক্ষ, বিপক্ষ, নিরপেক্ষ। ৭১। গরু—গাভী, বলদ. ষাঁড়। ৭২। ছাগ ও মেষ—পাঁঠা. পাঁঠি, খাসি। ৭৩। ফলের সাধারণতঃ অংশ—খোসা, শাঁস, আঁটি। ৭৪। পানের উপকরণ—চুন. খয়ের, সুপারি। ৭৫। জীব—ভূচর, খেচর. জলচর। ৭৬। সাইকেল—একচাকা, দুইচাকা, তিনচাকা। ৭৭। পৃথিবী—জল, স্থল অন্তরীক্ষ। ৭৮। চোর সাধারণতঃ—ডাকাত, সিঁদেল ছিঁচ্কে। ৭৯ বৎসরের মধ্যে মন্দ মাস—ভাদ্র. পৌষ, চৈত্র ৮০। বৎসরের মধ্যে পুণ্যাহ মাস—বৈশাখ. কার্ত্তিক, মাঘ। ৮১। ধান্য হইতে উৎপন্ন দ্রব্য—চাউল, চিড়া, খই ৮২। আহার—হবিষ্য. নিরামিষ, আমিষ। ৮৩। বর্ত্তমানকালের বাবুগিরির উপকরণ—চা, চুরুট, চুলছাটা। ৮৪। তামাক সেবনের অবস্থা—আমেরী দরবারী, ঝকমারী। ৮৫। বৈষ্ণবদিগের দেবতা—শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত। ৮৬। কলিকালের চেলা—রঘু, চৈমা, বলা। ৮৭। রাম-

দশরথপুত্র, পরশুরাম, বলরাম। ৮৮। তিক্তদ্রব্য—নিম, নিষিন্দা, মাকালফল। ৮৯। তিনটি বিষয়—আহার, নিদ্রা, ভয়। ৯০। ত্রিপাদ—ত্রিপাদ ভূমি, বলিরাজ উপাখ্যান দেখুন। ৯১। অনিষ্টকারী—উই, ইঁদুর, কুজন। ৯২। হিতকারী—ছুচ, সূতা, সুজন। ৯৩। সংসারে সুখের জিনিষ—গরু, জরু, ধান। ৯৪। সংসারে জব্দ করিবার লোক—কন্যা, পুত্রবধু, প্রতিবেশী। ৯৫। ফলের অবস্থা—কাঁচা, ডাসা, পাকা। ৯৬। সংসারে ক্ষণস্থায়ী—ধন, জন, যৌবন। ৯৭। ত্রিতাপ (ত্রিতাপ নাশিনী)—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। ৯৮। ত্রিবলি—উদর, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে মাংসের সঙ্কোচজনিত ৩টী রেখা। ৯৯। ত্রিমধু—ঘৃত, চিনি, মধু। ১০০। ত্রৈধাতুক—স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহরচিত। ১০১। বাজারের ৩চা জিনিষ—মুলো, থোড়, মোচা। ১০২। ত্রিকোণ মণ্ডল—পূজা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য। ১০৩। তেমোহনা—এক নদীর সহিত অন্য নদীর মিলন স্থানের নাম। ১০৪। ত্রিশূল—অস্ত্র বিশেষ যথা শিবের ত্রিশূলা, তিন ফলা বিশিষ্ট। ১০৫। চা পানের উপকারীতা—ম্যালেরিয়ানাশক, উত্তেজক, ক্ষুধানিবারক। ১০৬। দুঃখের কারণ—অজাত পুত্র, মৃত পুত্র, মূর্খ পুত্র। ১০৭। পাশা খেলার উপকরণ—ছক, ঘুটী, পাশা। ১০৮। ত্রিপাপী—৩টী পাপগ্রহ একসঙ্গে দৃষ্টি করিলে তাহাকে ত্রিপাপী কহে। ১০৯। ত্রিশূন্য—জমা খরচের মিলন হইলে উভয়দিকে যে ৩টী শূন্য দেওয়া হয় তাহাকে ত্রিশূন্য বলে। জমিদারী সেরেস্তায় খুঁজুন। ১১০। গায়কের গলা নষ্ট করে—ঘোল, কুল, কলা।*

[*স্থানাভাবে 'তিনের আদ্যশ্রাদ্ধ' শেষ হইল না। শঃ সঃ]

সমস্যা ও সমাধান

নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্তী।

জাতির অধঃপতন একদিনে হয় না। দীর্ঘদিনের কর্ম-বিমুখতা ও সাধনার ঔদাসিন্যে ধীরে ধীরে জাতির মধ্যে অধঃপতনের বীজ উপ্ত হয়। প্রথমে তা নজরে পড়ে না, তারপর সেই বীজ প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার শিকড় গেড়ে বিরাট মহীরূহের আকার ধারণ করে ও জাতির সমস্ত সত্তাকে অন্ধকারের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে তখন বোঝা যায় জাতি সর্বনাশের কত সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলার অধঃপতনের বীজ ধীরে ধীরে জাতির রক্তে অনেক আগেই সংক্রমিত হলেও বর্তমানে তা চরমে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলার জনসংখ্যার অল্পতা নেই, সাহিত্য ও সভ্যতার বিরাট সম্ভাবনা জাতির মস্তিষ্কে নীড় বেঁধেছে, তবু কিন্তু জাতি দিন দিন পঙ্গু হচ্ছে। সমাজের মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণী, যাঁদের অবসর সময় অপ্রচুর নয় তাঁরা তাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত আদর্শের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন অথচ জাতির জীবন নদীতে জোয়ার আসছেনা। বড় বড় পরিকল্পনা স্বর্গোদ্যাননির্ম্মানেই পর্য্যবসিত হচ্ছে—জাতির স্বাধীনতা দূরের কথা, জাতি পরাধীনতায় আরও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে। এর কারণ অন্বেষণ করলে দেখা যায় যে

দেশে যে পরিমাণ পরিকল্পনা আছে, বাস্তবক্ষেত্রে সে পরিমাণ কর্মের আগ্রহ নেই।

জাতির আর্থিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে হলে সরকার তথা অভিজাত ধনীগণকে পারস্পারিক সহযোগিতায় কার্য্যক্ষেত্রে নামতে হবে। বাঙ্গালী দরিদ্র, দেশ কিন্তু দরিদ্র নয়। দেশের ঐশ্বর্য্যসম্ভারকে কাজে লাগাতে পারলে জাতি অনশনে প্রাণ দেবে না। বাংলার প্রথম ঐশ্বর্য্য ভূমিজসম্পদ। বাংলায় কৃষির উপযুক্ত যে জমি আছে বর্ত্তমানে সমবায় পদ্ধতিতে ও বৈজ্ঞানিক-ভাবে যদি তার আবাদ চালান যায় তবে বাংলা বৎসরে যে শস্য-সম্পদের অধিকারী হবে তাতে তার অভাববোধের অনেকটা দূর হবে। নদী সংস্কারের দ্বারা বাংলার অংশ বিশেষের আবহাওয়া ও জমির উর্ব্বরতা শস্য উৎপাদনের অনুকূল হতে পারে। সরকার এবং ধনিক শ্রেণীর অর্থানুকুল্যে ও সাধরণের শ্রমে ইহা সম্ভব হতে পারে। এর জন্য দেশব্যাপী নিখিলবঙ্গ কৃষিপ্রতি-ষ্ঠান গড়ে, বিভিন্ন জেলায় ও প্রয়োজন মত বিভিন্ন কেন্দ্র তার শাখা প্রতিষ্ঠা করে দেশের সমগ্র কর্ষণোপযোগী জমিতে কাজ আরম্ভ করতে হবে। কোন্ জমিতে কোন্ শস্য উপযুক্ত, নিকৃষ্ট জমি কি ভাবে উৎকৃষ্ট হতে পারে বিশেষজ্ঞগণ তা নির্ণয় করবেন ও সেইমত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কৃষি চলতে থাকবে।

বাংলার দ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য খনিজসম্পদ। বাংলার যে সমস্ত খনিজঐশ্বর্য্য ভূপৃষ্ঠে লুক্কায়িত আছে তাকে আবিষ্কার করে বিভিন্ন

শিল্পকেন্দ্র সমবায় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে জাতির বহু বেকার কাজ পাবে। এর জন্যও দেশের মস্তিষ্ক, অর্থ ও শ্রম যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। কৃষি থেকে যা উৎপন্ন হবে তাতেও বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠবে ও জাতির আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ়ীকরণে তা অনেকটুকু কাজ করবে।

বাংলার তৃতীয় সম্পদ বনজ। বাংলায় বনভূমির অপ্রতুলতা নেই। বন থেকে বহু অর্থ জাতির ভাণ্ডারে আসতে পারে, যার সন্ধান জাতি রাখে না। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সরকারের সহযোগীতায় বনসম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে জাতির বহু বেকার কাজ পেতে পারে।

বাংলার জলজ সম্পদও বাংলার একটা বড় রকমের সম্ভাবনা। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের আর্থিক বনিয়াদ শুধু মাছের ব্যবসাতেই গড়ে উঠেছে। শুধু কড মাছ থেকেই তারা বছরে পৃথিবীর বাজার থেকে অনেক টাকা পায়। আমাদের দেশের ঝাড়, ইটা প্রভৃতি মাছেও নাকি কড অপেক্ষা বহুগুণ সমৃদ্ধ উপাদান আছে। বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে উহার তৈল নিষ্কাসন করে যদি আমরা বাইরের বাজারে তা ছাড়তে পারি তবে বৎসরে বহু টাকা আমাদের করতলগত হতে পারে। কচুরিপানা বাংলার অনেকখানি সর্বনাশ করেছে। এক টন কচুরিপানা থেকে কয়েক গ্যালন স্পিরিট প্রস্তুতের গবেষণা আমাদের দেশের জনৈক অধ্যাপক করেছেন। সত্যই যদি তা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় তবে কচুরিপানার

হাত থেকে আমরা যেমন নিস্তার পেতে পারি সেইরূপ বহু অর্থও ঐ অনিষ্টকর পদার্থ থেকে আমরা পেতে পারি।

বাংলায় ফলের অপ্রাচুর্য্য নেই। আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, কলা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের উপাদেয় ফল আমাদের কৃষিক্ষেত্রে জন্মাতে পারে। বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে উহা সংরক্ষিত করে বিভিন্ন মোরব্বা বা আচারের আকারে যদি বাইরের বাজারে তা ছাড়া যায় তা হলে বহু অর্থ দেশের ভাণ্ডারে আসতে পারে। উপযুক্ত জ্ঞান, অর্থ, গোচরণভূমি ইত্যাদির অভাবে দেশের গোজাতি ধ্বংসোন্মুখ। গোজাতির পরিপুষ্টি সাধন করে যদি যথেষ্ট পরিমাণ দুধ আমরা সংগ্রহ করতে পারি তবে দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত জমাট দুগ্ধ বা মাখন আকারে আমরা তা বিক্রয় করতে পারি। এ ছাড়াও পশমশিল্প, পশু-পালন, নানা প্রকার কুটীর শিল্প ইত্যাকার নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টা যাদি সার্থক হয় তবে দেশের আর্থিক বনিয়াদ যেমন সুদৃঢ় হয়, দেশও তেমনি বিভিন্ন ভাবধারা গ্রহণ করবার মত উপযুক্তক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে জাতির ক্ষুধার অন্ন জুটলে, সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষা, তার সংস্কৃতি অধঃপতনের গভীর গহ্বর থেকে বন্যার বেগে উৎসারিত হয়ে সার্থকতার নদীপ্রবাহে বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হবে।

নবলীলা

প্রফুল্লকুমার সরকার

দেখে ওই উষার আলো
উঠ্‌লো পাখীর কাকলি,
বনে বনে বাটে বাটে
ফুটলো রঙ্গীন ফুলকলি।

যুগোদয়ে নবজন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে শিক্ষালয়গুলি নবীনের হাসিতে প্রফুল্ল।

স্বার্থ ও হিংসার উপর তার অবস্থান। একদিকে জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের বিরাট অভিযান আর দিকে জগত আপন-করা ক্ষেম-উজ্জ্বল মুখোকমল। তাই ওই নবীনকে কবি ডাকিতেছেন—

"আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা"

একদিকে রাক্ষসী বুভুক্ষা, প্রলয়ের সংহারদৃষ্টি আর দিকে নবীনের প্রেম-আলেখ্য। একদিকে আঁধার-করা প্রলয় ধূমে বিশ্ব-রাজ্যের আদর্শ কোথায় বিলীন হইয়া যায়, অন্যদিকে তারই মঙ্গল দৃষ্টিতে দিকে দিকে দেশে দেশে মহামানবের মন বুদ্ধি লইয়া সৃষ্টির আলোক হস্তে ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসে। তাহারা গাহিয়া চলে—

"খেলতে খেলতে চলবো মোরা
হাসির খেলা সারা বেলা
আলোর খেলা সকল বেলা।"

চাহে মিলন, তারা চাহে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই গীতির অবসান। তাদের নব নব যাত্রাপথে নব নব বাউল সুর জুগিয়ে চলে—

"নূতন নূতন সবই নূতন
নূতন রঙের খেলা"

কখন বা

"নীল আকাশে তরী বেয়ে কারা ভেসে যায়,
নব যুগের নূতন মাঝি নূতন গীতি গায়।"

সেই সঙ্গীত মানবের জীবনে মহামানবের জীবনে নূতন যুগ গড়িয়া উঠে নবজন্মে নবলীলার সুরু হয়। ধরা পুলকে হাসে। মানুষকে মানুষ ভালবাসে, চিনতে পারে। প্রেমের রাজ্য ধরায় আসে নেমে। নবলীলার হয় সুরু।

"মানুষের নিজস্ব সম্পদ বলতে আছে শুধু মন আর দেহ। মন থাকে সবার ওপরে। সে দেহের প্রয়োজনে চালিত হয় না। মন একটী বৈপ্লবিক শক্তি সম্পন্ন বস্তু—যা উন্নততর ও প্রসারিতভাবে অনন্ত চিন্তাধারার নায়করূপে বিরাজমান। মন শাশত নয়—কিংবা ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ নয়—জড় জগতের উপাদনে গঠিত দেহের একটী গুণ-বিশেষ—তাই সেই মনকে দৈহিক কার্য্যাবলীর ওপর যদি নিয়মিত না না করা যায় তা হ'লে আরজকতা হবে অনন্ত, দুঃখ হবে অনাবিল, আর যাতনা হবে প্রশস্ত।"

কবিতায় অর্ঘ্য দিয়েছেন :—

সত্যেন্দ্রনাথ ধর কবিরঞ্জন বি-এল্ ।

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য ।

নীহাররঞ্জন সিংহ কবিভূষণ, সাহিত্যরত্ন ।

অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল এম-এ ।

সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এল্ ।

স্নেহলতা সিংহ রায় ।

ফণিভূষণ বিশ্বাস ।

পুতুল সেনগুপ্তা ।

হেমচন্দ্র বাগ্চী এম-এ ।

বিজলী চৌধুরী ।

সরোজিনী দেবী ।

জ্যোতির্ময়ী দেবী ।

শিবপদ চট্টোপাধ্যায় ।

জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

গীতা চট্টোপাধ্যায় ।

সরোজবন্ধু দত্ত ।

বীণাপাণি দেবী ।

রাখালদাস সিংহ ।

আবার জাগিতে হবে

সত্যেন্দ্রনাথ ধর

(১)

আজি, আবার জাগিতে হবে,
বাংলার ছেলে, বাংলার মেয়ে
বাঙালীর গৌরবে।
বাংলার সেই নব-জাগরণে
গাহিল বাঙালী যে উছল মনে
সুপ্ত ভারতে দীপ্ত করিতে
ধ্বনিতে হইবে প্রাণে,
সেই বাংলার গানে।

(২)

আজি, আবার জাগিতে হবে,
বাংলার জ্ঞানে বাংলার মানে
বাঙালীর উৎসবে।
বাংলার ছেলে শিরায় শিরায়
মুক্তি-শিখার দীপ্তি ছুরায়,
মহাভারতের মহা-বেদীতলে
মহা-মিলনের ধ্যানে,
বাঙালীর এই প্রাণে।

(৩)

আজি, আবার জাগিতে হবে,
বাংলার পণে বাংলার মনে
বাঙালীর জয়-রবে।
মাতৃ-পূজার হয় নাই শেষ
বোধন মন্ত্র সবে উন্মেষ ;—
চাহেনা বাঙালী বিভেদ-বুদ্ধি
বিভাগের উপদেশ,
দ্বন্দ্ব, কলহ, দ্বেষ।

(৪)

আজি, আবার জাগিতে হবে,
বাংলার ছেলে বাংলার মেয়ে
বাঙালীর সৌরভে।
বঙ্কিম, হেম, শ্রীমধুসূদন
বিবেকানন্দ, শ্রীরামমোহন
দ্বিজেন্দ্র সুরেন চিত্তরঞ্জন
যতীন্দ্র ভৈরবে,
রবীন্দ্র গৌরবে।

(৫)

আজি,   আবার জাগিতে হবে,
দীপ্ত ভানুর উজ্জ্বল কিরণে
রাষ্ট্র জগৎ নভেঃ
রচিবে বাঙ'লী যুক্ত-ভারত
ঘুচায়ে কালিমা বিভাগের-পথ
বাংলার ছেলে বাংলার মেয়ে
বাঙালীর বৈভবে,
ভারতের জয়রবে।

শক্তিপূজা

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

অর্ঘ্য তোমায় দেওয়ার তরে, সাজিয়েছিলাম ডালা,
চন্দন-ধূপ-গন্ধ-আতর, হবির প্রদীপ জ্বালা।
হায় গো এতে তৃপ্ত নহ! কি চাই তোমার বালা?
চাইলে তুমি, রক্তমাখা রক্তজবার মালা!

সত্যেরে পাই অলিক মায়ায়

নীহাররঞ্জন সিংহ

স্বপন নদীর কিনারে বসেছি,
অবগাহনিব আমি যে।
কোন সুদূরের অজানার হতে
চলে, ক্ষণ নাহি থামি যে :
ও চলনময়ী ও ছলনাময়ী,
অনাদি কালের সবা-মনজয়ী,
স্বপনময়ীর ওই মায়া নীরে,
সিনানের তরে নামি যে।

আমার জনমে জীবনে মরণে,
যা কিছু মধুর মানি গো।
মায়াময়ী ওগো সুন্দরী ধরা,
স্বপনেতে ভরা, জানি গো।
সে স্বপনে মোর জেগে ওঠে প্রাণ,
এ জীবনে ভরে শত মধুগান,
সত্যেরে পাই অলিক মায়ায়
তাই এ সিনানকামী যে।

—— ⁂ ——

কৃত্তিবাস
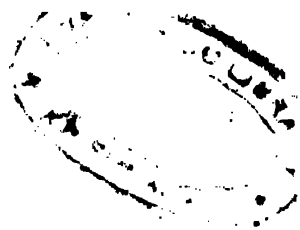
বিনায়ক সান্যাল

নিদ্‌হীন আঁখি ; জেগে' বসে' আছি বাতায়ন-পথে চেয়ে।
নীরব গগন বেয়ে'
নিশুতিরাতের অশরীরী আশা চেতনার ফাঁকে ফাঁকে
হাতছানি দিয়ে ডাকে।
সহসা যেন সে বহুদূর হ'তে ভেসে আসে কোন্ সুর—
অস্ফুট, তবু করুণায়-ভরা কাকলী সে সুমধুর।
অতীতের ঢালু সানুতট বাহি' সেই ধ্বনি-সঙ্কেতে
ফিরিলাম কত মন্ত্র-মোহিত সে সুর-তীর্থে যেতে।
পাঁচশ বছর—যেন সে নিমেষ !— অনায়াসে হ'নু পার,
পশিল আকুল শ্রবণ-কুহরে অপরূপ ঝঙ্কার !

*　　*　　*　　*　　*

দীর্ঘ-আয়ত দীপ্ত মূরতি, আননে ইন্দু-লেখা
বীণা-হাতে কবি গাহে রাম-গান মেঘলোকে যেন কেকা,
যেন মধু-মাসে পিককলগীতি উছলি' বহিয়া যায় ;
জানকী-বিরহে কাঁদে রঘুমণি, বায়ু করে হায় হায়।

*　　*　　*　　*　　*

এ তো শুধু নয় একটি যুগের—একটি দেশের গান।
এ স্থর-প্রসূন কালে কালে অম্লান।
কিশোরের সাধ, যুবার স্বপন, প্রবীণের শেষ আশা—
নিখিল প্রাণের সকল কামনা তব গীতে পেল ভাষা।
সব বয়সের সকল মনের সাথে হয় তব মিল,
দূর ও নিকটে করে গলাগলি, ভেদ নাহি এক তিল।

* * * * *

অমর গীতের অনাদি উৎস তুমি;
গোমুখী-ধারায় সিঞ্চিত আজো তৃষিত বঙ্গভূমি।
যুগে যুগে কত কবি
তোমারি প্রসাদ লভি',
প্রাণ হ'তে পেয়ে প্রাণ
বহিল ললিত লহরী-লীলায় অমৃতের সন্ধান।
যে পুলিনে বসি সেধেছিলে, কবি, তান
সে সুরধুনীর ধারার মতই বাণী তব বহমান।
কভু উদাত্ত, উপলব্যথিত, কভু বা স্বরিত স্বরে;
মেঘডম্বরু কভু গুরু গুরু, ঝর ঝর কভু ঝরে!
হয় নাই, কভু হ'বে নাক নিঃশেষ,
তোমার কাব্যে অচিহ্নিতের লভিয়াছি উদ্দেশ!
ধূর্জটি, তব জটাজাল হ'তে রামায়ণী-ধারা ঝরি'
ধিক্‌কৃত এই জাতিরে লইল অমর জীবনে বরি'।

ভক্ত যেমন জাহ্নবী-জলে জাহ্নবী-পূজা করে,
তোমারি প্রসাদকণিকায় কবি পূজা-থালি তার ভরে।
বৈষ্ণব কবি মিলায় তাহার অশ্রুর অঞ্জলি,
গহীন ব্যাথায় প্রাণ উঠে চঞ্চলি'।
শাক্ত ভক্ত মিলায়েছে কোথা বীর্য ও পৌরুষ—
সাহসে অটল, রণে দুর্বার, জড়তার অঙ্কুশ।
সব ধারা হারা তব স্রোতোধারে, কারে চেনা নাহি যায়,
অনামা কবির কত না রচনা এক হ'য়ে গেছে হায়।

*　　*　　*　　*　　*

ব্রীড়া-সুমধুর পল্লীবধূর রুচির চিত্রসাথে
ঢালিলে মায়ের মেদুর মমতা অশ্রুবিধুর রাতে।
ত্যাগে গরীয়ান্ জীবনাদর্শ দেখাইলে জনে জনে,
কল্প-বরণে শুভ আলিপনা আঁকিলে গৃহাঙ্গনে।
বিশ্বের কবি নিখিল কালের, তবু বাঙলার তুমি,
ফুলিয়া সে আজ মোদের তীর্থ-ভূমি,
ধন্য আমরা তোমার মাটিতে লভেছি জনম ঠাঁই,
ধন্য আমরা সান্ত্বনে তব, ব্যথা-তাপ ভুলে যাই।
বাণী-দেউলের বর-পুরোহিত, বাল্মীকি বাঙলার,
হে কৃত্তিবাস, চরণে তোমার প্রণমি বারম্বার।*

---

* ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস জন্মোৎসবে পঠিত।

প্রগতি

সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(সারি গান)

(১)

গতিবেগ উদ্দাম, দুনিয়ার দুর্দ্দম,
বাসনার শিখাসম বেড়ে চলে হর্দ্দম,
করুণার কণা কোথা ? প্রাণ পূরে ল'বে দম,
তার তরে তিল ক্ষণ নাই রে ;
আগে ভাগে হেঁকে চল ভাই রে।

(২)

সপ্ত সাগর জল মন্থনে টলমল,
অধীর বাসুকী আজি উগারিছে হলাহল,
বিদীর্ণ ব্যোম্, মহী, বেড়িছে অনলদল,
বসুমতী হবে বুঝি ছাই রে,
আগে ভাগে হেঁকে চল ভাই রে।

(৩)

রেলগাড়ী নহে আর, কিম্বা মোটরকার,
আধুনিক মাপকাঠি গতিবেগ মাপিবার,
এরোপ্লেন করিয়াছে যত গতি অধিকার,
আকাশে যে সদাগতি তাই রে ;
আগে ভাগে হেঁকে চল ভাই রে।

(৪)

চল রে বীরের দল মরণোৎসবে চল,
গৃহকোণে আর কেন আঁখি করি ছলছল,
রাখিতে মায়ের মান প্রাণে আন নব বল,
স্বদেশ স্বরগাধিক ঠাঁই রে,
আগে ভাগে হেঁকে চল ভাই রে।

(৫)

তুই কিরে অনুদিন, চিন্তায় তনুক্ষীণ,
আঁকড়িয়া ইতিহাস রহিবিরে চিরদিন,
হের পৃথিবীর গতি, কি প্রাচীন কি নবীন
বলে 'সকলের আগে যাই রে';
আগে ভাগে হেঁকে চল ভাই রে।

নিদ্রে

স্নেহলতা সিংহ রায়।

অয়ি সুন্দরী, নির্ম্মলা অয়ি, নিদ্রা লো শ্রমবিনাশিনী।
ক্লান্তি হরণ করিবারে তুমি স্বপন-মধুর সুহাসিনী।
শ্রান্ত হৃদয় লইয়া এসেছি লভিতে তোমার ও-ক্রোড়ে ঠাঁই,
মঙ্গল কর বুলাও নয়নে যেন এ জীবনে শান্তি পাই।

ফিরে চলো

ফণিভূষণ বিশ্বাস

বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতার মাঝে, নির্ম্মম নিষ্ঠুর
কালের বীণায় বাজে বেদনার সুর।
চিত্ত-হীন সভ্যতার যান্ত্রিক-দানব
নিশ্চিহ্ন করিতে চায় পৃথ্বীর মানব,—
বি-দগ্ধ করি' যত সৌন্দর্য্যের রাশি,
মানুষের সুকুমার বৃত্তি গুলি নাশি',
জ্বালিয়াছে মানুষের অন্তর গহ্বরে
শতাব্দীর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত করে।
হিংসার কুটিল ক্রূর ধূমায়িত বহ্নির শিখায়,
ধ্বংসের দেবতা নৃত্যে—বহ্নিমান-শ্মশানের ছায়—
নরমেধ যজ্ঞস্থুর পশ্চিমের সমর প্রাঙ্গণে;
শঙ্কিত ব্যথায় তায় আশাহত মনে—
"ফিরে চলো, ফিরে চলো" যেন কেবা বলে,
অস্ফূট গুঞ্জন সাথে না জানি কি ছলে,
অসহ্য আকুতি স্বরে নির্ম্মম ব্যথায়—
বিভোল বিবশ করি' আমার অন্তর।
"কিন্তু কোথা—যাইবো কোথায়?"—
আলোড়িয়া এ মর্ম্ম-প্রান্তর

জিজ্ঞাসিছে বারবার অন্তরের আমি ;
তখনও কে বলে যেন, "এইপথে নামি'
সভ্যতার দিগন্তের পারে চলো ফিরে,
অতীতের বহুদূর শতাব্দীর তীরে।
উজ্জয়িনীর রেব নদী কূলে—
ছায়া ঘেরা তপোবন মূলে,
চিত্তের শান্তির লাগি একান্ত গোপনে—
এসো গিয়া বসি মোরা সেথা আনমনে।"
অতীত-সারল্য-মাখা সেই দিনগুলি,
শান্তির অমিয়ভরা শিহরণ তুলি,
ফিরিয়া আসুক সেই বিগতের স্বপ্ন মায়া-সনে,
পাখী-ডাকা-মুকুলিত সহকার বনে,—
আরক্ত কুঙ্কুম-রাগে রঞ্জিত সে বসন্তের দিন ;—
সহাস্য-কৌতুকরসে চিত্ত অমলিন।
প্রেমের রভসে চিত্ত সেথা ফুল-বনে,
ভরে উঠে জীবনের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি সনে
নৃত্যের ছন্দের তালে মেতে উঠে ধীরে।
আবার কে যেন বলে —"হেথা নয়, চলো ওগো ফিরে।
আরো—আরো দূর সেই অতীতের ঘন অন্ধকারে,
সভ্যতা-উদয়াচল সিন্ধু-নদী-পারে
বহু দূর শতাব্দীর কোন্ নব সুপ্রভাত কালে,

সামগান মুখরিত তপোবনে—মৌন অন্তরালে,
আপন হৃদয়ে করি' অসীমের অন্ত অনুভব
ভূমানন্দে মাতি যেন প্রশান্ত নীরব—
ফিরে পাই যেন কোন বাঞ্ছিত সে শান্তির আগার,
নির্ব্বাণ-আনন্দ-মাঝে চিত্তে আপনার।
সেই দিন, সে আনন্দ, সে সারল্য চিত্ত মোর চাহিছে সদাই;
কলুষ কুটিল এই সভ্য-রূপ চাহে না সে তাই।
এ মোর চিত্তের শান্তি করিয়া হরণ,
লাঞ্ছনা বেদনা মাঝে জীবনে মরণ,
আনিয়াছে বেদনার আর্ত্তকলস্বরে
অন্তরের উচ্চাসন চিররুদ্ধ ক'রে,
মানুষে করেছে ক্রূর হৃদয় বিহীন।
এ সভ্যতা চাহি নাকো আর কোন দিন!
বুভুক্ষু অন্তর চাহে "স্নিগ্ধ-শান্তি—কোথা আছে বলো;
মানস ক্রন্দসি কাঁদে, "হেথা নয়, ফিরে চলো, চলো।"

নিশ্চুপে

পুতুল সেনগুপ্ত

রূপ্-শতদল ফুট্‌লো যখন—প্রেম্-রূপে।
মন্-ধূপে মোর লাগ্‌লো অনল নিশ্চুপে॥

নীড়

হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

জলতলচ্ছায়ালীন পঞ্চবটীতটে যা'রা বাঁধিয়াছে নীড়,
তাহাদের ভালো ক'রে চিনি নাই, তবু তা'রা আসিয়াছে মনে।
ভালো তা'রা বাসিয়াছে, প্রাণভ'রে চিরদিন আস্বাদ গভীর
অনুভব করিয়াছি মনে মনে, হেরি নাই এ রূপ জীবনে।
এই দীনহীন-বাস, করুণলোচন এই ম্লানমুখ অজ্ঞাতের দল,
এই ফলশস্যহীন, পাণ্ডু, রুক্ষ ক্ষেত্রমাঝে নতনেত্রে জীবন-যাপন,
এই ক্লান্ত জীবনের মাঝখানে শ্যামলিম সুধাধারাজল—
আরেক জীবন যেন সুজাতার পায়সান্ন করিছে বহন।
বৃক্ষশাখে গাহে পাখী, খর্জ্জুরবীথির স্বপ্ন দিনমান নয়নে ঘনায়,
জম্বীর-নিকুঞ্জমাঝে খসি' খসি' পড়ি' যায় গুঞ্জরিণ নবীন মুকুল,
খরানিয়া চৈত্র রৌদ্রে দক্ষিণশায়িনী হাসে, ক্লান্তস্বরে ঘু-ঘু
ডেকে যায়।
সেদিনের ভাঁটিফুলে আর কোনো রঙ, যেন জীবনের আর
কোনো ভুল;
মনে পড়ে গ্রামবনসীমন্তিকা কা'রা যেন সুগভীরে মনে মনে
করিছে রচনা
কা'রা যেন ভালবাসে, আরো যেন ভালবাসে, ভরি' তোলে
স্বপন সৃষ্টির।

নিদাঘের রুক্ষ রৌদ্রে ক্লান্ত ধরণীর সুরে মনে আনে গোরী
গোরোচনা
প্রজাপতি উড়ে যায়—জীবনের প্রজাপতি আনো মনে
বপন বৃষ্টির,
আনো মনে প্রজাপতি, দূরায়িত প্রজাপতি, আনো মনে ক্ষুধা ও
মরণ,
আনো মনে দূরদিন গাঢ় কৃষ্ণ অবলেপ, আনো মনে সবুজ স্বপন !

জাগরণ

বিজলী চৌধুরী

প্রভাত ভানুর ছোঁয়াচ লাগি, ফুটলো রে মন-শতদল।
কাহার মধুর মোহন সুরে, রাঙলো রে এই ধরাতল ॥
ফুল-কুঁড়ি আর কিশলয়ে, বন-বীথি আজ টলমল।
লতার বুকের লাজ টুটেছে, বিলায় কুসুম পরিমল ॥
স্বপনভরা রূপ-মাধুরী চাইলো রে মোর আঁখিপল ;
কার পরশের আনন্দে গো উছল হলো হিয়াতল।

সিন্দুর

সরোজিনী দেবী

আর্য্য-রমণী-সিঁথিকা শোভিনী, অয়ি লো, সিঁদুর বিন্দু!
উষসী-সবিতা উদিয়াছে যেন, উজলি অসীম সিন্ধু!

বুঝি বা তোমায় এনেছে দেবতা, নারীরে বাসিয়া ভালো;
রমণীর তুমি আদরের ধন, ললনা-ললাট-আলো।

বালিকা-জীবনে প্রথম মিলনে, পতির প্রথম দান,
— সে যে সোহাগের কি অনুরাগের, প্রেমে ভরা সম্মান!

ধরমে করমে জীবনে মরণে, তোমারি চরণে ঠাঁই!
তোমারি শোভায় নারী শোভাময়ী, 'উষা-ভানু' তুমি তাই!

সধবা-জীবন-গগনের আলো নির্ম্মল প্রেমে মাখা;
সীতা-সাবিত্রী-সতী-পদরেণু তোমা বুকে আছে আঁকা।

মঙ্গল তুমি, সুন্দর তুমি, দেবতারও তুমি মান্য;
প্রীতির বাঁধনে নারী জীবনেরে তুমি করিয়াছ ধন্য।

আশা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

আমার রাত্রি দিনের পরে
আশীষ তোমার পড়বে ঝ'রে,
এই টুকুন্‌ই অনেকখানি আশা;
সকল কাজের পাশে পাশে,
মুহূর্ত্ত যে যায় আর আসে,
জমিয়ে তুলি' অনেক কাঁদা হাসা!
তারির মাঝে এই টুকুন্‌ই আশা!
সন্ধ্যা হবে প্রভাত হবে,—
বিরাম এবং কলরবে,—
কথায় কথায় কতক-হারা ভাষা;
তারির মাঝে এই টুকুন্‌ই আশা
কথার আড়ে, কাজের স্রোতে,
প্রহর গোণায়, পথে পথে,
মনের মাঝে রচিয়া নিল ভাষা;—
চিরদিনের অনেকখানি আশা।

নক্ষত্র

শিবপদ চট্টোপাধ্যায়

কথা কও, কথা কও।
অভিধাবিহীন চিরসুদূরের দীপ্ত অক্ষ'হিনী
নীল অম্বরে গোপনে রও,
হে নক্ষত্র, কথা কও, কথা কও…

মেদুর বাতাসে অনিলয় অভিসারে
বিস্ময়-ঘেরা মনের দুয়ারে কী দিঠি হানো,
অপস্রিয়মান নিমেষপ্রহরগুলি,
ছুটে যায় দূরে যৌবন পাখা তুলি,
সৃষ্টি কুহেলী তনু তটে তুমি কী সুর আনো !

পরিচয় মোর, পরিচয় তব সাথে
ক্ষণভরসার আশার প্রদীপলতা,
রৌদ্রবিহীন ছায়ালোক কুহেলির
ক্ষণভঙ্গুর দুর্গম পথচলা,
অন্তবিহীন বারিধির পরিধিতে,
সসীমা শৈল স্রোতা ছুটে ছুটে চলে,…

তারি সঙ্গীতে মুখর রও,
হে নক্ষত্র, কথা কও, কথা কও !

বন্ধুতা মোর বাধাহীন অভিসারে
স্বপনসুরভি সাথে সার্থক মানি,
মোর অচেতন দেহতটে রাখে, শিহর যে বারে বারে,...
আর্দ্র রজনী কাঁপিয়া কাঁপিয়া করে যেন কানাকানি,
অনুতে অণিমাঅনুভূতি রেখে যাও
সুদূর দীপ্তি সমীরেরে ভালবাসি,
সংখ্যাবিহীন প্রেমচুম্বনে মনের গহীনে
হয় বিলয়,
ব্যোম পরিসরে জ্যোতির সফেণপুঞ্জ
হাজার যোজন সুদূর দিগন্তরে
তব প্রেম নিলয়...

স্তব্ধ আকাশ সুনীল চোখের অশ্রু কি ও
অথবা সে কোন শাশ্বত বালকের
উড়ায়েছ হোথা চুমকিখচিত রঙীন উত্তরীয়,
প্রেমস্ফুলিঙ্গ, মেঘ দেখে বারে বারে
লুকায়ে রও,
প্রেমিকা তাহার বাতায়নে চায়, তব পানে চায়,
হে নক্ষত্র তার সাথে তুমি কি কথা কও !

শিবপদ চট্টোপাধ্যায়

যুগযুগান্ত দিশায়িত তব, চাওয়া-পাওয়া ফেলে যাওয়া,
রাত্রি জোয়ারে দিনদিনান্ত অবগাহন,
বসুধার তুমি ব্যথা ও বীর্য্য প্রতীক সৃষ্টিধর,
হাসিতে অশ্রু অশ্রুতে হাসি নির্ঝর
জীবন ঘেরিয়া মিলনে বিরহ পরিবেদন,
বিরহে মিলন চাওয়া ··

এই চিনি তোমা, এই হোথা তুমি বিদায় লও,
সন্নিধিতরে বাজে হতাশার ক্রন্দন,
দূর প্রান্তর অশ্রুম বন বিতানের
নীলসবুজের স্পর্শে স্পর্শে লেগে কি রও,
খদ্যোতিকার দুর্ব্বার কোলাহল
নিভু নিভু তবু জেগে কি কও।

চাওয়া মোর, এই ক্ষণ চাওয়া নিরবধি
—নিসর্গরাণী বুকভরা যৌবনে, হয়েছে অভ্রভেদী,
অদ্ভুৎ, তব নীল দিঠি হানি, হৃদয় তাহার কাড়িয়া লও···
সহসা সূর্য্য আলোকের সংঘাতে
তাহারে লইয়া আঁধারের আঙিনাতে ডুবিয়া রও,
অন্তবিহীন পাথারের প্রাসাদেতে
হে নক্ষত্র, তার সাথে
তুমি, কি কথা কও·

দয়া ও মায়া

জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দয়া বলে, "শুন মায়া, এ-কথা ভুল না,—
তোমাতে-আমাতে কভু হয় কি তুলনা ?
সীমার ভিতর তুমি, মোর সীমা নাই।
চরাচর মোর কাছে যাচে বর তাই ॥
কঠিন বাঁধনে তব বাঁধা সব জীব।
তুমি না ছাড়িলে তা'রা নাহি পায় শিব ॥
কাটিতে তোমার ডোর চাহে যে সকলে।
অর্থ-কাম অনর্থের মূল তোমা বলে ॥
মোহিনীর গুণ তব, শ্লাঘ্যগুণ নয়
আমাকে ধরম জ্ঞানে পূজে বিশ্বময় ॥
তুমি বদ্ধ, আমি মুক্ত, অবনী-ভিতরে।
তাই ত' আসন মোর তোমার উপরে ॥
তুমি ভোক্ত্রী, আমি ত্রাত্রী, কত ব্যবধান !
কি সাহসে হ'তে চাও আমার সমান ?"

*　　*　　*　　*

মায়া কহে, "দর্প তব আমাকে লইয়া ;
আমার বিহনে তুমি যাও যে ভাসিয়া ॥
মহামায়া স্বজেছেন নিখিল ভুবন।
তিনিই করেন তা'কে ধারণ-পালন ॥
রাজেন মোহিনীরূপে ত্রিমূর্ত্তি সকাশে।
ত্রিবর্গ আমার মাঝে তাই ত' বিকাশে ॥

হেরি যে বড়াই বড়; ভেবে দেখ মনে,—
দয়াল ঠাকুর বাঁধা আমারি বাঁধনে ॥
আমি আছি ব'লে তাই তোমার আদর।
ফুলের সোহাগে ছোটা লভে যে কদর ॥
তুমি বড় আমি ছোট, ভেদ-জ্ঞান কত!
আমাতেই আছ তুমি, অধীন সতত ॥
আমার অধীনে থাকি' মোক্ষ কিসে দিবে?
মায়াতীত নাহি হ'লে ত্রাণ কি মিলিবে?
দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ, সব তাতে রয়.
নিছক গুণের নিধি কেহ ভবে নয় ॥
ত্যজ অহমিকা, সখি! এস পাশে মোর।
অসূয়া ভুলিয়া, এস. পাতি প্রেম-ডোর ॥
কথা কাটাকাটি মিছা, কি ফল বল না?
তুলনার কথা মুখে কখনো তুল না ॥"

সান্ত্বনা

গীতা চট্টোপাধ্যায়

আলোর পিছে আঁধার আছে, এ কথা ত' নিত্য না;
সুখের পরে দুঃখ এলে সেই ত' মোদের সান্ত্বনা।

কাব্য-মরীচিকা

সরোজবন্ধু দত্ত

শৈশব হ'তে ভেবেছিনু আমি আঁকিয়া যতনে ছবি;
বিশ্বমাঝারে হ'ব একজন একালের মহাকবি।
বিশ্বমানব দেখিতে শিখিবে সাথে মোর এই কায়া,
কাব্যপ্রভার স্নিগ্ধ-সরস-উজল বিশ্ব ছায়া।
নিত্য নূতন গড়িয়া তুলিব, জড়েরে করিব ত্রাণ,
শাশ্বত শত বিশ্ব-প্রেমের গাহিয়া চলিব গান।
সম্পদে যশে মহীয়ান হবো, গৃহে গৃহে পাব ঠাঁই,
সুখৈশ্বর্য্যে ভাগ্যদেবীর নাহি রবে তুলনাই।
সব আশা মোর হ'য়ে গেল ক্ষীণ, শুধু এ যে মরীচিকা,
কবির জীবন দুঃখে ভরেছে, ইতিহাসে আছে লিখা।
কত কবি তার স্বপনে রচেছে জীবন-সৌধ-মাল,
সব একদিন ভেঙ্গে ধূলিসাৎ ক'রে দেছে মহাকাল।
মনে পড়ে আজ হেলেন-দরদী কবি কীট্‌সের কথা,
কবি-সম্রাট ছিলো সে যে তবু, মরমে লভেছে ব্যথা।
সমালোচনার তীব্র দহনে কীর্ত্তি হয়নি হ্রাস,
ক্ষয়রোগ তার নশ্বর-দেহ অকালে ক'রেছে গ্রাস।

কবি বার্নস্ মনের আবেগে বুনেছিলো মায়াজল,
জীবন যাপিতে মাঠে মাঠে তাকে চষিতে হয়েছে হাল।
চ্যাটার্টন্ কবি কাব্য-আরাধি কাটায়েছে দিনরাতি,
সংসার জ্বালা সহিতে নারিয়া হ'য়েছে আত্মঘাতা।
বাণীর পুত্র কবি মাইকেল শত লাঞ্ছনা সহি,
জীবন-কাটাল' দুখের পশরা মস্তকে তাঁর বহি।
এই সব কথা মনে পড়ে যবে যতেক বাসনা মোর—
মরুভূমি প্রায় শুকাইয়া যায়, হাসে মরীচিকা ওর।
নবীন বয়সে কত শত কথা পুলকিত করে মন,
নূতন নূতন কত যে স্বপন হৃদে জাগে অনুখন।
ডুবে সব আশা নিরাশা-নদীর গভীর-কাজল-নীরে,
হৃদয় গগনে ঘন-অমানিশা ঘনায়ে আসে যে ধীরে।

সত্য

বীণাপাণি দেবী

অলীক দেখি, সবই কিছু
যেই দিকেতে চাই
শুধুই হেথা মৃত্যু সম
সত্য কিছুই নাই।

মরণ বাঁচন

রাখালদাস সিংহ

মরণ বাঁচন দু'টার মাঝে
বাঁচতে সবার সাধ।
মরণ তবু সত্য চির
এই তো পরমাদ।

অমানিশার অন্ধকারে,
চেতনহারা ঘুমের দ্বারে,
স্বপ্নে-ছাওয়া মধুর মোহন,
দেখ্‌তে চাওয়া চাঁদ।

মরণ খেলা খেল্‌তে ব'সে,
মরণকে যে ভুল্‌ছে ও সে,
বাঁচতে চাওয়া—প্রেমের রসে
গলায়-পরা ফাঁদ।

মায়ার ফাঁদে যতই কষে,
সুখের নেশা ততই বসে,
মরণ-ভরা এই জগতে
বাড়ায় অবসাদ।

গল্পে রূপ দিয়েছেন :—

বীরেন্দ্র মোহন আচার্য বি-এস সি।

অজিত কুমার পাল চৌধুরী।

সমীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায়।

নির্মল চন্দ্র দত্ত।

ক্ষিতীশ চন্দ্র কুশারী বি-এ বি-টি।

নন্দ গোপাল পাঠক।

অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী, পুরাণরত্ন।

মোল্লা মোহম্মদ আবদুল হালিম, এম-এ, বি-এল।

ননী গোপাল চক্রবর্ত্তী বি-এ।

নীহাররঞ্জন সিংহ, সাহিত্যরত্ন, কবিভূষণ।

মাকড়সা ও মক্ষিকা

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

—কথা হইতেছিল প্রেম লইয়া।

আলোচ্য বিষয় বস্তুটি এমন গুরুতরও নহে, অভিনবও নহে যে তাহার কথা সকলকে 'ফলাও' করিয়া শুনাইতে হইবে। অত্যধিক আলোচনার ফলে পচিয়া উঠিয়াছে এমন কথা যদি জগতে কিছু থাকে ত সে হইল প্রেম। অন্ততঃ—আমাদের ক্লাবের মেম্বরদের ইহাই ধারণা। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে এমনি যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা না করিলেও হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা ছাড়া আমাদের চলিতেছে না। —অর্থাৎ আমাদের গোবর্দ্ধন প্রেমে পড়িয়াছে। অবাক কাণ্ড আর কাহাকে বলে?

তিনকড়ি ত শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল "বলিস কি, আমাদের গোবরা পড়েছে লভে, তার চেয়ে বল না কেন তাকে ভুতে পেয়েছে—"

অন্তা একশত টাকা বাজী পর্য্যন্ত ধরিতে রাজী, সে বলে নিশ্চয়ই শুনিতে ভুল হইয়াছে। লভে নয় লাভে পড়িয়াছে গোবর্দ্ধন—

কথাটা মিথ্যা নয়। পয়সা ছাড়া মন দিবার মত পৃথিবীতে আর যে কিছু আছে গোবর্দ্ধন তাহা স্বীকার করিত না। প্রেমে পড়া ত দূরের কথা, রূপা ছাড়া রূপ ও যে মানুষের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে এই সহজ সত্যটাই তাহাকে আমরা এতদিন কিছুতেই বুঝাইতে পারি নাই। অথচ সেই গোবর্দ্ধনই বলা নাই কহা নাই, অকস্মাৎ প্রেমে পড়িয়া বসিল। সব চেয়ে দুঃখের কথা, দুদিন আগেও আমরা তাহার এই দুর্ঘটনার কথা জানিতে পারি নাই। নির্জীব পাষাণের বুকে যে

এত বড় একটা উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণ ঘুমাইয়াছিল তাহা অগ্ন্যুদ্গিরণের আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই, হয়ত গোবরাও পারে নাই। ইহাকে দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলিব?

অবশ্য ভগবান গোবর্দ্ধনের বাহিরের চেহারাটা দিয়েছিলেন নেহাৎ মন্দ নয়। রংটাও ফর্সা গঠনটা ও চলনসৈ বলিতে হয়। মোটের উপর প্রসাধন সামাগ্রীর জোরে আপ্রাণ-সাধনায় ঘসিয়া মাজিয়া তুলিতে পারিলে কলিকাতার মত জায়গায় যে একটা কিছু সুরাহা না হইয়া যাইতে পারিত এমন নহে। কিন্তু এই দিকেই ভগবান মারিয়াছেন গোবর্দ্ধনকে চেহারাকে বিকৃত করিবার যতগুলি উপায় সম্ভব গোবর্দ্ধন তাহার কোনটি লইতেই ত্রুটী করে নাই। ন' হাত্তি মলিন বসন উন্মুক্ত গাত্র পায়েথ রম, বিপর্য্যস্ত কেশ ও বেপরোয়া মুখভঙ্গী লইয়া বন্ধুবর যে ভাবে সগর্ব্বে ঘুরিয়া বেড়াইত তাহাতে প্রেমের অ্যাক্সিডেণ্ট হওয়া সম্ভব নহে।

প্রেমের অ্যাক্সিডেণ্ট হওয়া সম্ভব নহে।

অবশ্য গোবর্দ্ধন নির্ব্বোধ নহে, পৃথিবীর সব কিছুই সে বোঝে, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক দিকটা। তবে কি জানি কেন, নারীঘটিত সর্ব্বপ্রকার আলোচনায় তাহার আশ্চর্য্য রকম নির্লিপ্ততা। হয়ত মনের ঐ সদর দরজাটা তাহার খোলেই নাই। যৌবন তাহার কবে আসিল, যাইতেই বা দেরী কত কোন খবরই সে রাখিত না। এমনকি প্রেম-বস্তুটির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত অজ্ঞতা লইয়া সেদিন পর্য্যন্ত যাহাকে ঠাট্টা করিয়াছি সেই গোবর্দ্ধনই কি না শেষে অকস্মাৎ প্রেমে পড়িয়া বসিল। বিশ্বাস করা সহজ নহে তবু বিশ্বাস করিতে হয়, কারণ, খবরটা আমাদের ক্লাবের নিজস্ব সংবাদদাতার সংগৃহীত।

গোবর্দ্ধন কি একটা বীমা কোম্পানীর দালালী করিত এবং ঐ কার্য্যে তাহার উৎসাহেরও অবধি ছিল না। শুনিয়াছি কুম্ভীর কবলিত হইয়াও যদি বা সৌভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হয়, ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট কবলিত হইলে আর রক্ষা নাই এবং সেই এজেন্ট যদি গোবর্দ্ধন হয় তাহা হইলে কি হয় তাহা অনুমান সাপেক্ষ মাত্র। গোবর্দ্ধনের সহিত আলাপ রক্ষা করিব এবং নিজে বীমা হইতে রক্ষা পাইব, এই দুইটা একসঙ্গে সম্ভব নহে। রক্ষা আমরা পাই নাই, সেজন্য দুঃখ নাই, তবে বন্ধুর এই দুর্ঘটনায় তাহাকে রক্ষা করিব কি করিয়া তাহাই ভাবিতেছি।

বঙ্কা জলন্ত বিড়িটায় একটা সুদীর্ঘ টান দিয়া বলিল "ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। বলি, ভেতরকার আসল খবরটা কেউ বলতে পার ?—"

আমরা যাহা জানিতাম তাহা এই— গোবর্দ্ধন কিছুদিন পূর্ব্বে নাকি বীমার কাজে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মছলন্দপুর গিয়াছিল। বীমা

কি রকম হইয়াছিল জানিনা তবে কয়েকদিন পরেই আবার গিয়াছিল, তারপর আবার, তারপর আবার, পৌনঃপুনিক ইত্যাদি। শুনিতে পাই বীমার কাজ এখন প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে, ক্লাবে আসাও ছাড়িয়াছে; পথে ঘাটে হঠাৎ দেখা হইলেও আড়াল দিয়া চলিতে চায় সব সময়ই অন্যমনস্ক, দীর্ঘনিশ্বাসও মাঝে মাঝে হয়ত ফেলে লুকাইয়া। বুক পকেটে এখন বীমার নোটবুকের পরিবর্ত্তে এক পয়সার টাইম টেবিল—তাতে মছলন্দপুরের আপ ডাউন ট্রেনগুলি কালি দিয়া আণ্ডারলাইন করা। একেবারে শেষ অবস্থা। হ্যাঁ, বলিতে ভুলিয়াছি মছলন্দপুরে যে বাড়ীতে গোবর্দ্ধন বীমার টোপ ফেলিয়াছিল সেখানে নাকি একজন সুন্দরী সুশিক্ষিতা পশ্চিমে প্রতিপালিতা তন্বীতরুণী আসিয়াছেন সম্প্রতি। সুতরাং উক্ত উপসর্গগুলি হইতে রোগ স্পষ্টই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যাহাকে বলে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ—

ইহারও ভিতরে আর কি খবর আছে তাহা জানিবার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। খবর যাহাই হউক, ভিতরে আরো কথা আছে শুনিলেই মনটা আরো গভীরতম রহস্যের আশায় চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু আমরা ভিতরের কথা জানিবার জন্য যতই চঞ্চল হইতেছিলাম বঙ্কা ততই নির্লিপ্তভাবে বিড়ি টানিতে টানিতে চোখ টিপিয়া বলে—"হবে হবে, সময় হলেই সব জানতে পারবে আমি আগেই বলেছিলাম কি না—হুঁ হুঁ—"

সময়ই বা কবে হইবে, বঙ্কুবিহারীই বা ইতিপূর্ব্বে কি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিল বুঝিতে না পারিয়া ঔৎসুক্যের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছিল বঙ্কার এই অযথা মুন্সিয়ানা বদের ভাল লাগিল না। লাগিবার কথাও নহে, কারণ এই গোবর্দ্ধন ঘটিত গোপন সংবাদের সমুদয় কপিরাইট

তাহারি। মহলন্দপুর তাহার দূর সম্পর্কের মামার বাড়ী এবং সে-ই প্রথমে এই দুর্ঘটনার সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া দেয়। সে কহিল "ভেতরের কথা আবার কি? মনোহর চক্কোত্তি চিরকালটা ত দিল্লীদিল্লী করেই কাটিয়েছে সবাই জানে পয়সাও রোজগার করেছে খুব। এখন বুড়ো বয়সে বাপমা মরা নাতনীটিকে সঙ্গে করে কিছুদিন হল গাঁয়ে এসেছে বসবাস করতে। তবে বুঝলে ভায়া, শুনেছি একটা পয়সা পিত্যেস নেই কারো। বুড়ো একেবারে যাকে বলে হাড় কঞ্জুস। লোকে নাকি এর মধ্যেই হাঁড়ি ফাটবার ভয়ে—"

অম্বা অধৈর্য্য হইয়া বলে—" আরে রেখে দে তোর হাঁড়ি ফাটার গল্প। গোবরায় নামেই বড় আস্ত থাকে তা বুড়োকে দেখে তার ভয়! রতনেই রতন চিনবে ত এ আর বেশী কথা কী? তার নাতনীর কথা কি জানিস তাই বল—"

বদে একটু ঢোক গিলিয়া বলিল "আমি অবিশ্যি দেখিনি তবে শুনেছি মেয়েটাই বুড়োর নয়নের মণি। নাম নাকি অতসী দেবী, বুঝতেই পারা যাচ্ছে খুব অপটুডেট সুন্দরী। চিরকাল ত পশ্চিমেই মানুষ কিনা, অপটুডেট আর স্মার্ট ত হতেই হবে। ও সব জল হাওয়ার গুণই হল গিয়ে আলাদা ভায়া। আমার ছোটশালীও পশ্চিমে মানুষ কিনা। ও একরকম নেচার ভাই। তুই যদি আমার ছোট শালীকে দেখিস ত—" তিনকড়ি মুখ সিঁটাইয়া উঠিল—আরে ধৎ তোর ছোটশালীর না কিছু বলেছে। আসল কথা ফেলে রেখে উনি বসলেন ছোটশালীর গল্প নিয়ে—" বদে রুখিয়া উঠিল "দ্যাখ তিনকড়ি, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"—আহা হা কর কি কর কি'—হৈ হৈ করিয়া আমরা গণ্ডগোল থামাইয়া দিলাম।

বদে তিনকড়ির দিকে একবার তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টি হানিয়া আবার শুরু করিল 'মানে, কথা আর কি! তবে গোবরার ত আমাদের মত মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেলামেশার অভ্যেস নেই।" তিনকড়ি আবার ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, আমরা থামাইয়া দিলাম। বদের ভ্রূক্ষেপ নাই, সে বলিয়া চলিয়াছে—'না পড়েচে আজকালকার প্রগতি সাহিত্য, না বেড়ায় লোকে, যে প্রেমে পড়ার পথে কিছু সুরাহা হবে; কিন্তু এইবার হল অ্যাক্সিডেণ্ট। শ্রীমতী অতসী দেবী বোধহয় গোববার সঙ্গে একটু ফ্রিলি মিক্স করেছেন, কিম্বা ইন্সিরেন্স নিয়ে ইকনমিক্সের পয়েণ্টে তর্ক করে হারিয়ে দিয়েছেন বাস এতে যা হবার তাই হয়েছে। ও সব আপটু ডেট মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাই দায় কিনা। সেবার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে আমার ছোটশালীর সঙ্গে—" হঠাৎ তিনকড়ির হুংকারে চমকাইয়া বদে থত মত খাইয়া গেল। অন্তা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বুঝেছি ভাই ও সব ত গোবরার দেখা শোনা অভ্যেস নেই কথনও তাই ঐ রকম স্মার্ট পশ্চিমা চালচলনের ধাক্কায় আমাদের গোবর গণেশ গোবর্দ্ধনচন্দ্র আর তাল সামলাতে পারল না। কথায় বলে নারীর টান না দড়ির টান বুঝলে কিনা, হাজার হলেও গোবরা পুরুষ মানুষ ত।

মাথাই বলিয়া উঠিল "অন্তা তোর ও আর্গুমেণ্টটা একদম অচল। গোবর্দ্ধনদা এই কোলকাতায় কোন আপটু-ডেট স্মার্ট আর সুন্দরী দেখেনি নাকি এর আগে কখনও, যে ঐ মছলন্দপুরের সুন্দরী দেখেই তার মুণ্ডু ঘুরে যাবে। যত সব বাজে—"

কেলো কবি। কি একটা সদাগরী অফিসে কেরাণীগিরি করে এবং সময় পাইলে গদ্য ছন্দে অতিআধুনিক কবিতা লিখিয়া কাবা

চচা করে। সে বাধা দিয়ে বলিয়া উঠিল "ভাখ মেধো যা বুঝিসনে তা নিয়ে কথা বলতে যাস কেনরে? সব জিনিষেরই একটা প্রপার ব্যাকগ্রাউণ্ড চাই, বুঝলি। কোলকাতার আবহাওয়ায় যেটা খুবই সাধারণ বলে চোখ এড়িয়ে চলে যাবে মছলন্দপুরের শ্যামল পল্লীশ্রীতে তা' অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠতে পারে সমস্ত রূপই ফুটিয়ে তুলতে হলে তার প্রপার সেটিং চাই—নইলে আসলে ভালমন্দ বলে কিছু নেই—সবই হল আপেক্ষিক মানে রিলেটিভ। রিলেটিভিটি থিওরীও ত এই

রিলেটিভিটি থিওরী জানিতাম না। বৈজ্ঞানিক সূত্রের কাব্যিক ব্যাখ্যা শুনিয়া অবাক হইলাম। স্বীকার করিতেছি, অধুনা মছলন্দপুর নিবাসিনী অর্থকুস্তীর মনোহর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র পৌত্রী শ্রীমতী অতসী দেবী হয়ত অতসীবর্ণাভা অপরূপ সুন্দরী ও যথোচিত আপটুডেট ও আলোক প্রাপ্তা। কিন্তু আমাদের গোবর্দ্ধনকে ত চিনি। শ্রমতীর সুরুচির কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কারণ প্রেম অন্ধ, পক্ষান্তরে এমন শুষ্ক কাষ্ঠকে যিনি রসায়িত করিতে পারিয়াছেন তিনি আর কিছু না হইলেও যে অসাধ্যসাধনকারিণী তাহাতে সন্দেহ নাই। যে গোবরা বিবাহের কথা তুলিতেই কাগজ কলম লইয়া হিসাব করিতে বসিত একটা রাঁধুনি রাখা সস্তা, না বৌ পোষা সস্তা। প্রেমের কথা তুলিতেই বোকার মত মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে হাই তুলিতে আরম্ভ করিত, সেই গোবরাকে যিনি এমন করিয়াছেন তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার না জানাইয়া পারিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম—"দূর হোক গে ছাই, বোদেকে ধরিয়া একবার মছলন্দপুর ঘুরিয়া আসলে মন্দ হয় না।"
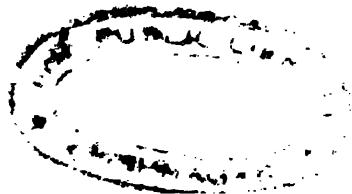
তিনকড়ি হঠাৎ মাধাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া গান ধরিল—'হরি নামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে বল মাধাই মধুর স্বরে—হরি নামের গুণ দেখেছিস—বিপুল হাসিতে ফাটিয়া পড়িল তিনকড়ি। কেবলরাম এতক্ষণ একটা কথাও বলে নাই। আজ কবিরাজী ভোজ হয়ত একটু বেশীই হইয়া গিয়া থাকিবে। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘরের কোনে একটা নিবন্ত বিড়ি মুখে দিয়া ঝিমাইতেছিল। তিনকড়ির গিটকিরি দেওয়া হাসির ধমকে জাগিয়া সোজা হইয়া বসিল, পরে বিড়িটা ফেলিয়া অর্দ্ধজড়িত কণ্ঠে বিজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করিল যে এমন যে হইবে তাহা নাকি সে আগেই জানিত। মনস্তত্বের দিক দিয়া গোবর্দ্ধনই নাকি প্রেমে পড়িবার ঠিক একমাত্র এবং উপযুক্ত পাত্র। কারণ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রেম সম্বন্ধে যে যত বেশী উদাসীন হইবে অকস্মাৎ প্রেমে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনাও তাহারি নাকি ততোধিক। প্রেম এতকাল গোবর্দ্ধনের ত্রিসীমায় প্রবেশ পথ পায় নাই, যখন পাইল তখন তার প্রচণ্ড টান হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

এই ভাবের অনেক কথাই কেবলরাম বলিয়া গেল। তাহাতে ব্যাপারটা যাহা বুঝিলাম—বয়স যথেষ্ট হইলেও গোবর্দ্ধন এতকাল যৌবনজলতরঙ্গকে কঠিন বাঁধ দিয়া ঠেকাইয়া নিশ্চিন্তমনে জীবন-বীমার লাঙ্গলে মানব জমি আবাদ করিয়া রজত ফসল ফলাইতেছিল। এইবার অকস্মাৎ মছলন্দপুরের কোন রহস্যময়ী তন্বী তরুণী সহস্তে কোদালী দিয়া বাঁধ কাটিয়া দেওয়ায় চারিদিকে জলে জলময় হইয়া গিয়াছে। থৈ থৈ করিতেছে প্রেমের জোয়ার। গোবর্দ্ধন সাবধান হইবার সময় পায় নাই। সাঁতারও জানেনা সুতরাং ডুবিয়া মরা ছাড়া

তাহার আর গতি নাই। কেবলরাম প্রেম সম্বন্ধে অথরিটি—এমনই নাকি হইয়া থাকে। দুঃখের কথা, না আনন্দের কথা—কে জানে?—বেচারা গোবর্দ্ধন।

কিছুদিন পরে বদে সংবাদ আনিয়া দিল গোবর্দ্ধন কয়েকদিন হইল বিবাহ করিয়াছে এবং মছলন্দপুরেই আছে।

হুররে—প্রেম করিয়া বিবাহ করিতেছে অথচ বন্ধুবান্ধবদের একটা খবর ত দিলই না, উপরন্তু আড্ডার পথও ছাড়িয়াছে জন্মের মত। আমরা কি তাহার সুন্দরী বধুকে খাইয়া ফেলিতাম।

বদে বিরক্তস্বরে কহিল—'এ সব মাইরি, ভেরি ব্যাড। ফ্রেণ্ডদের বাদ দিয়ে কি এসব কাজ হয়?

অন্তা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল—তা যাই বলিস ভাই গোবরার এটা কিন্তু ভারী অন্যায়। সংসারে তার ত সত্যিকার আপনার বলতে আমরাই কয়জন। সেবার যখন নিমুনিয়া হয়ে পড়েছিল তখন আমি আর বঙ্কাই ত রাত জেগে নাস করতাম তাকে আর এখন বিয়ে করবার সময় আমরা হলাম গিয়ে পর—"

অভিমান হইবারই কথা, তবে গোবর্দ্ধনের অবস্থা বিবেচনায় ক্ষমা করা ছাড়া উপায় নাই। নিমজ্জমান ব্যক্তি ডুবিতে বসিয়া যদি হিতাহিত জ্ঞানের সম্যক পরিচয় দিতে না পারে কিম্বা কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটি ঘটায় তবে আমরা, অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যদি না ক্ষমা করিব, তাহা হইলে আর কে করিবে। যাহা শুনিতেছি তাহাতে বুঝিলাম গোবর্দ্ধন ডুবিয়া মরিতেছে। সুতরাং ক্ষমা না করিয়া উপায় নাই। স্থির করিলাম কালই অতর্কিতে মছলন্দপুরে গিয়া গোবর্দ্ধনকে অপ্রস্তুত করিয়া যথোচিত শিক্ষা দিব এবং তৎসঙ্গে সেই অসাধ্য সাধনকারিণীকেও

প্রপার সেটিং এ দেখিয়া জীবনের একটা নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিব।

ক্লাবে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। স্থির হইল আগামী কল্য আহারাদির পর বেলা এগারটার গাড়ীতে রওনা হইব এবং বৌ দেখিয়া সন্ধ্যায় ট্রেণেই ফিরিয়া আসা চলিবে।

স্থির ত হইল, কিন্তু বৌ দেখা বলিলেইত দেখা নয়। অপ-টু-ডেট শিক্ষিতা তন্বী তরুণী তায় লভ করিয়া বিবাহ, উপহার বেশ একটা ভাল রকমই দেওয়া চাই। বিশেষতঃ আমাদের যখন গোপন করিয়াছে গোবর্দ্ধন, তখন যা'তা' কিছু দিলে ত প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। করি ত সামান্য কেরাণীগিরি, সারা মাস রক্ত জল করিয়া যাহা রোজগার হয় তাহাতে কুড়িটা দিনই কুলায় না লৌকিকতা রক্ষা করি কি দিয়া।

—কি মুস্কিলেই পড়া গিয়েছে।

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকারে এক জোড়া প্রকাণ্ড মিনা-করা দুল কিনিয়া ফেলিলাম। দুলটি বেশ, অষ্ট কোন্ বিশিষ্ট রৌপ্য জালের মধ্যস্থলে রক্তচক্ষু মেলিয়া একটি নীল মাকড়সা বসিয়া। আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলের অন্তরাল হইতে শুভ্রগণ্ডযুগলের পটভূমিতে দোদুল্যমান নীল মাকড়সা দুটি কেমন মানাইবে কল্পনা করিয়া পুলকিত হইলাম। নাঃ, গোবর্দ্ধনই আমাদের মধ্যে ভাগ্যবান বলিতে হইবে। অথচ কত ঠাট্টাই করিয়াছি তাহাকে লইয়া। অজ্ঞাতে কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন ফাঁক ফাঁক। যাক্ গে—

কেলোকে দিয়া একটা পত্র লিখাইয়া লইলে মন্দ হয় না—হে বন্ধবী ঊর্ণনাভের মত অদৃশ্য জাল বুনিয়া পল্লীর অন্তরালে তুমি যাহার জন্য এ যাবৎ অপেক্ষা করিতেছিলে সেই মক্ষিকা এখন জালে পড়িয়াছে! এইবার তুমি—ইত্যাদি, এম্নিভাবের কিছু।

যাহা হউক যথানির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি সাজিয়া গুজিয়া পুরু ভেলভেটের বাক্স সমেত দুল জোড়াটা বুক পকেটে ফেলিয়া বাহির হইলাম ও যথাসময়ে ক্লাবের কয়েকজন সভ্যসহ মছলন্দপুরগামী ট্রেণখানি রওনা হইয়া পড়িল।

কৌতুককর ঘটনার আসন্ন সম্ভাবনায় মনটা সকলেরই প্রফুল্ল। গন্তব্যস্থান যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, উৎসাহ ততই প্রবল হইয়া উঠিল, কি জব্দই হইবে গোবর্দ্ধন। যেমন আমাদের বাদ দেওয়া তেমনি তার শাস্তি। বেচারা বোধ হয় লজ্জায় আর মুখ পাইবে না।

অন্তা কহিল "দেখা হলে মাইরী, যা ধূনব গোবরাকে, সে আমার মনেই আছে, আমাদের বাদ দিয়ে বিয়ে?—কেন, আমরা কি বিয়ের সময় বলিনি কাউকে?"

মাধাই বলে—"ও কথা বল্লে হবে না ভাই, আমাদের হল গিয়ে আলাদা, যাকে বলে ধরে বেঁধে ওষুধ গেলান। ঢক করে গিলে ফেল্লাম, ব্যস মিটে গেল, পেটে গিয়ে অ্যাকসন্ হচ্ছে তেত কি মিটে বুঝলাম না। আর এত তা নয় ভাই লভের ব্যাপার, একটু গোপন রাখতে হবে বইকি। নইলে বুঝছো তো"—গাড়ীর মধ্যে একটা হাসির দমকা উঠিল। বন্ধা আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল 'হ্যারে গোবরা যদি তার ওয়াইফের সঙ্গে আমাদের ইন্‌ট্রোডিউস না করে দেয়—"

বলিলাম—"না, তা কি হয় ? বৌ দেখবার রীতি ত সব দেশেই আছে বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবদের ত একবার—"

অন্তা হুঙ্কার দিয়া উঠিল—"ওসব ঘোমটা তুলে এক নজর সিল্কের পুঁটলী দেখালে চলবে না বাবা রীতিমত সহস্তে চা জলখাবার দেবে, ফ্রিলি গল্পগুজোব করবে, চাই কি একটু গানটানও, কি বলিস বদে ?"

বদে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসিয়া উত্তর দিল অমূলক সন্দেহ, পশ্চিমে প্রতিপালিতা অপ-টু-ডেট তন্বীতরুণী সম্বন্ধে কোন ধারণাই কাহারো নাই। তাহার ছোট শালীর সঙ্গে আলাপ থাকিলে তাহাদের এমন অদ্ভুত ধারণা হইতে পারিত না, ভাব কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তাহারা জানে। 'ফের বদে—আদেখ্‌লে কোথাকার" অধৈর্য্য তিনকড়ি গর্জ্জন করে। মাধাই জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা ওসব কথা যাক্‌, অনুমান করে বল দেখি অতসী দেবী দেখতে শুনতে কিরকম হতে পারেন"।

বদে বাজী ধরিয়া বলিল অজানিতা বন্ধুপত্নীর রংটা একটু শ্যামলা না হইয়াই পারে না, যেহেতু আজকালকার আলোকপ্রাপ্তা অপ-টু-ডেট তরুণীরা নাকি অধিকাংশই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বদে উক্ত যুক্তির উদাহরণস্বরূপ তাহার কনিষ্ঠা শ্যালিকার বর্ণের বর্ণনা করিতে যাইতেই তিনকড়ির হুঙ্কারে থামিয়া গেল। বদের দোষ নাই উহা তাহার কেমন মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া গিয়েছে। তিনকড়ি প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় বদে তাহার উক্ত শ্যালিকার উল্লেখ করিলে তাহাকে ট্রেন গলাইয়া ফেলিয়া না দিয়াছে ত তাহার নাম তিনকড়িই নহে।

এম্নি করিয়া সারা রাস্তা হাস্যপরিহাসে আলাপ আলোচনায় বন্ধুপত্নীর যে চিত্র আমরা আঁকিলাম তাহাতে সকল কবির কল্পনাই হারিয়া

যায়, যাহা হউক এইভাবে মনোহর বাবুর বাটীর সীমানায় গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। পাকা বাড়ী এবং বড়ই বলিতে হয়।

দূর হইতে দেখিলাম, পিছনদিকে একটুখানি ঘেরা সজীবাগান ও একখানি ভাঙ্গা দোচালা সম্ভবতঃ গোশালা তারিপাশে একজন ঘনকৃষ্ণবর্ণা স্থূলমধ্যাঙ্গী খর্ব্বকায়া স্ত্রীলোক পর্ব্বতপ্রমাণ গোবর চাপিয়া ঘুটে দিতে ব্যস্ত। পরণে লালপাড় ন' হাতি মোটা সাড়ী বিরাট কটিদেশ বেষ্টন করিয়া জড়ান, হাত দুইটা কনুই অবধি গোময়লিপ্ত। কেশবিরল মস্তকের আধখানি সিঁথা জুড়িয়া তেলসিঁদুর দপদপ করিতেছে। বক্‌! আমার পা টিপিয়া কানে কানে বলিল—"ও বাবাঃ রক্ষেকালীর বাচ্ছা নাকি রে?"

কবি কেলো চাপা গলায় শুধু মন্তব্য করিল—"ব্যাড টেষ্ট"। বদে ফিসফিস করিয়া উত্তর দিল—"অপ-টু ডেট বাড়ীতে এ রকম ঝি রাখা মোটেই চলে না, রাত্রে দেখলে মূর্চ্ছা যেতে পারে কেউ। আজকাল-কার বাড়ীতে ঝি চাকরবাও কেমন দিব্যি ফিটফাট যে দেখলে তাক লেগে যাবে। আমার শ্বশুর বাড়ীতে যদি একবার যাস্—"।

তিনকড়ি আবার একটা অস্ফুট গর্জ্জন করিয়া উঠিতেই থামাইয়া দিলাম। বুঝাইয়া বলিলাম—পল্লীগ্রামে ওরকম হইয়া থাকে, তাহাতে গৃহস্বামীর রুচির বিচার করা চলেনা সব সময়ে। তাছাড়া সাহেবদের আয়ারাও ত সব পরীর বাচ্ছা নয়

কথায় কথায় বৈঠকখানা ঘরে উঠিয়া আসিতেই দেখি আমাদের গোবর্দ্ধন একটা খাটিয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া প'ড়িয়া আছে, বোধ হ দ্বিপ্রাহরিক ঘুমের আয়োজন। আমাদের দেখিয়া একেবারে ধড়ম

করিয়া উঠিয়া বসিল, অকস্মাৎ যেন চমকাইয়া উঠিয়াছে। উঠিবারই কথা এইটুকু মজা করিবার জন্যই ত এত পরিশ্রম, এত অর্থ ব্যয় করিয়া ছুটিয়া আসা। তারপর সকলে মিলিয়া গোবর্দ্ধনকে কত অনুযোগ কত প্রশ্ন কত রসিকতাই যে করিলাম তার আর শেষ নাই। কিন্তু গোবর্দ্ধন সেই যে কাঠ হইয়া বসিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল হাঁও করেনা. নাও করেনা।—একেবারে বেকুব বনিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ জেরা করিবার পর ক্রমশই বিরক্ত হইয়া পড়িতেছি এমন সময় গোবর্দ্ধন আবার সেই হাড় জ্বালান হাসি হাসিয়া বলিল—"কিছু মনে করিসনে ভাই, ইন্সিয়োরেন্সের ব্যাপার কিনা—ফার্ষ্ট প্রিমিয়ামটা দেবার আগে লোক জানাজানি করাটা আমাদের নিষেধ, জানিস্ ত ?"

গোবর্দ্ধন বলে কি ? মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি ! বলিলাম "কি বাজে বকছিস পাগলের মত, ইন্সিয়োরেন্সের কথা নয়, বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

গোবর্দ্ধন তেমনি হাসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া, স্বর নামাইয়া কহিল—"ও সে এক কথাই। তোরা যাকে, বিয়ে বলছিস, আমি তাকেই বলছি ইন্সিওরেন্স। একেবারে ফিফটিন থাউজেণ্ড রুপীস এন্‌ডাউমেণ্ট পলিসি, মানে –

মানেটা আরো একটু চাপা গলায় প্রকাশ করিল—ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে মনোহর বাবুর অর্থাৎ দাদাশ্বশুরের বিষয় সম্পত্তি আর নগদে তা ধর গিয়ে হাজার পনের বিশ টাকার কম নয়। কিন্তু বুড়ো হচ্ছে হাড় কঞ্জুষ। বেঁচে থাকতে একটি আধলা কারো পিত্যেশ নেই বাবা, তা সে, যাই কর আর যাই হও। একটা মাত্র নাতনী আছে, সেই হল

গিয়ে একমাত্তর উত্তরাধিকারী আর তিনকুলে ওর কেউ নেই। ব্যস বিয়ে করে ফেল্লাম, মানে টাকাটা ইন্সিয়োর্ড হয়ে রইল, এখন বুড়ো মলেই পলিসি ম্যাচিওর্ড। তবে মেয়েটা যতকাল বেঁচে থাকবে খোর-পোষটা লাগবে। তা ধর ঐটেই প্রিমিয়ম হল আর কি! খুব চুপি চুপি সারতে হল কিনা; যে কাম্পিটিসনের বাজার। বিনে পয়সায় নাতনীর বিয়ে দিয়ে বুড়ো ভাবছে খুব দাঁও মারলাম কিন্তু আমি এদিকে হুঁ হুঁ বাবা পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্যাটা আর টু ইয়ার্সের বেশী নয়, যে অ্যাজমা। ব্যস তখন আর আমাকে পায় কে?”

আবার সেই হাসি। রাগে ঘৃণায় সমস্ত শরীরটা রিরি করিতে লাগিল, এইজন্যই কি এতদূর ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। গোবর্দ্ধন আরো কতকগুলো কি বলিয়া গেল কানে ঢুকিল না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বোকার মত চাহিয়া আছি হঠাৎ গোবর্দ্ধন আমার গায়ে একটা চিমটি দিয়া সহাস্যে বলিল—“তা এতদূরই যখন এলি তখন পলিসির বহরটা একটু দেখেই যা”।

গোবর্দ্ধন চট করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়া একটু পরে ফিরিয়া আসিল এবং পিছন পিছন যিনি আসিয়া হাজির হইলেন কিছু পূর্ব্বেই তাঁহাকে বহিরাঙ্গনে গোময় পিষ্টক প্রস্তুত করনে ব্যাপৃত দেখিয়া আসিয়াছি। সদ্যধৌত হাত দুইটা আংশিক পরিমাণে গোময়লিপ্তই আছে তবে কোমরের কাপড় খুলিয়া আবক্ষ ঘোমটা দেওয়া হইয়াছে। বন্ধু ঘোমটা তুলিয়া মুখ দেখাইতে ব্যস্ত হইতেই নিরস্ত করিলাম।

করিয়াছে কি গোবর্দ্ধন! কি বলিব ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। বন্ধুরা দেখি ততক্ষণে উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, বসে সব পিছনে। আমিও নামিবার উপক্রম করিতেই গোবর্দ্ধন তেমনি সপ্রতিভ ভাবেই

বলিল "এখনই চল্লি? বুড়োর সঙ্গে আলাপ টালাপ, আচ্ছা থাক তাহলে আর এ বেলার মধ্যে ট্রেন পাবিনে। কিছু মনে করিসনে ভাই, বিজনেস ম্যাটার কিনা। চুকেবুকে গেলেই নিশ্চিন্ত হয়ে ক্লাবে যেতে পারব।" —অকস্মাৎ আমার স্ফীত বুক পকেটটায় অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ও বাবাঃ ওটা আবার কি ঢুকিয়েছিস রে পকেটের মধ্যে, দেখি দেখি—"

"—ও কিছু নয়" বলিয়া অর্দ্ধচেতন অবস্থায় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। পকেটের ভিতর হইতে রক্তচক্ষু মেলিয়া নীল মাকড়সা ছুটি বুকে দংশন করিতে লাগিল। চ'খের সামনে মাকড়সার জাল সমস্ত মছলন্দপুর জুড়িয়া আছে। দেখিলাম তাহার দুই কোণে দুইটি কীট, গোবর্দ্ধন ও মনোহর চক্কোত্তি। ইহাদের কোনটি মাকড়সা কোনটি মক্ষিকা চিনিতে পারিলাম না।

এদিক-ওদিক

অজিতকুমার পাল চৌধুরী

স্বামী-স্ত্রী ইডেন গার্ডেনে।

পাড়াগাঁয়ের স্ত্রী অবাক্ হ'য়ে এদিক-ওদিক চাইছে।

স্বামী—ঠিক হ'য়ে চুপ ক'রে চল। এদিক-ওদিক তাকিও না। নইলে এখু'ন একটা বিপদ—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটী আপ্-টু-ডেট্ ভদ্র মহিলা স্বামীটির সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেলেন।

স্ত্রী—এদিক-ওদিক তাকিও না। ছিঃ!

লুকানো চিঠি

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

কলিকাতা সহরের একটা বড় রাস্তা, নাম না করলেও চলে। বড় মানে শুধু লম্বা চওড়ায় নয়, দারুণ ভীড়, বাস, ট্রাম, মোটর, লোক প্রভৃতিতে বেশ সরগরম। একটু অন্যমনস্ক হলেই আর রক্ষা নেই, একেবারে সশরীরে স্বর্গের দ্বার দেখা যাবে। একদিন চলেছি সেই রাস্তা দিয়ে, কি একটা খুব জরুরী কাজে। গন্তব্য-স্থানে পৌঁছে, কাজ সেরে যখন পথে নামলাম তখন বেশ একটু রাত হ'য়ে গেছে। পূর্বে সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে আলোকমালা জ্বলে উঠতো সহরের বুকে আর ঝলমলিয়ে দিত সারা সহর। দিন কি রাত কিছু বুঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন আর তার সে রূপ নেই, যৌবনের সে উচ্ছলতা নেই, এখন দূরে দূরে এক একটা আলো টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে মৃত্যুগামী হৃদপিণ্ডের মত, তাও আবার আষ্টেপৃষ্ঠে ঢাকা। মনে হয় অতর্কিত কোলকাতা যেন ভয়ে মূহ্যমান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখ দুটো বুজে—তার সে প্রাণ নেই সে আনন্দ নেই, সে রূপ নেই।

পথে যখন নামলাম, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তাই ভাবছিলাম কিসে ফিরি বাসে ট্রামে না হেঁটে? হঠাৎ পিছন

থেকে কে চীৎকার ক'রে উঠল "শুনতা নেই। এ বাবুজী" তাকিয়ে দেখি একখানা মোটর অন্ধকারে প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। যেই একটু অন্যমনস্ক হ'য়েছি অমনি বিপদ। যাক ফাঁড়া ত উপস্থিত একটা কেটে গেল। কপালে কি আছে কে জানে ? সাত পাঁচ ভেবে ও শূন্য পকেট হাৎরিয়ে ক্ষুন্নমনে শেষে হেঁটেই গৃহাভিমুখে যাত্রা করলাম।

প্রায় মিনিট সাতেক চলেছি কোলকাতার আলো-আঁধারের রূপ দেখতে দেখতে ; হঠাৎ পিছন থেকে একটা লোক ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌লে "ও, বাবু সাহেব শুনুন।" আমি আরও হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌লাম। ভয় ও আশঙ্কা দুই-ই আমার হয়েছিল— যদিও দুর্ভাবনার মত কাছে কিছুই ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় সেও চলেছে আমার পিছু পিছু আর বল্‌ছে, "বাবু দাঁড়ান, দাঁড়ান" এদিকে পা দুটির চলন শক্তি যতই কমে আসছে ভয়ও ঠিক ততই বেড়ে চলেছে। ডাকতে কা'কেও সাহস হচ্ছিল না। ভয়ে মুখ গলা শুকিয়ে সব যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ল এই ব্ল্যাক্-আউটের রাত্রিতে কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খুন, জখম, রাহাজানির খবর খবরের কাগজ খুললেই যা রোজ চোখে পড়ে ! চিৎকার করতে চাইলাম কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না। শেষে অনোন্যপায় হয়ে ছুটতে সুরু করলাম, দেখি সেও ছুটতে আরম্ভ করেছে, তখন একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

পা কিছুতেই আর এগুলো না। বাক্‌শক্তিও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। লোকটা আমাকে এসে ধরে ফেল্‌ল ও একটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ তার থলে হ'তে বের ক'রে বল্‌ল, "এই নিন, কা'কেও দেখাবেন না, চলে যান কোন ভয় নেই, রাস্তায় খুলবেন না যেন"—বলে আমার পকেটের মধ্যে নিজেই জোর ক'রে কাগজটা পুরে দিয়ে চলে গেল। আলো-আঁধারে দেখলাম লোকটার পরিধানে বহুরূপীর মত রংবেরংএর পোষাক। আচ্ছা বিপদ তো, কি কাগজ দিল যে এত গোপনীয়! চিঠি দিয়ে ডাকাতি: চোরাই মাল! জাল নোট না বিপ্লবী ষড়যন্ত্র—? ভয় করতে লাগল, কেউ দেখেনিত? একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলাম সন্দিগ্ধ চিত্তে! খানিকটা আশ্বস্ত হ'লাম। নানা চিন্তা করতে করতে বাড়ীর দিকে হন্‌ হন্‌ করে আবার পা দুটো চালিয়ে দিলাম। মনটা কিন্তু পড়ে রইল পকেটের ভিতর। অজানার প্রতি এই দুর্দ্দান্ত কৌতূহল দমন করা সহজ নয়।

* * *

বাড়ী গিয়ে ঢুকতেই খানিকটা বকুনি হ'য়ে গেল ব্ল্যাক্‌-আউটের বাজারে দেরী ক'রে ফেরার জন্যে; নির্ব্বিবাদে তা সহ্য ক'রে উপরে গিয়ে দরজায় দিলাম খিল। বারান্দার দিকের জানলাটিও বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে বসে পড়লাম চেয়ারে।

অতি সন্তর্পণে পকেটে হ'তে বের ক'রে দেখি, একখানি কাগজ দু'ভাঁজ করা। ওপরে মোটা মোটা ক'রে লেখা রয়েছে

লুকানো চিঠি

"লুকানো চিঠি" আবার চিঠির তলায় 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' বলে লেখা আছে, "মালিক ভিন্ন খুলিবেন না। অবিবাহিত বালকবালিকার পাঠ নিষেধ। পাঠান্তে প্রিয় বন্ধুকে পড়িতে দিবেন।" চিন্তা করতে লাগলাম পড়ব কি না? এখনও তো বধূর মুখ দেখিনি অথচ অবিবাহিত বালক-বালিকার পাঠ নিষেধ। অশ্লীল কোন কিছু আছে নাকি? গাটা শিরশির করতে লাগল—অনেক কিছু ভেবে আস্তে আস্তে ভাঁজ খুললাম; খুলে দেখি একদিকে একখানা চিঠি আর অন্য দিকে একখানা ক্যাস মেমো। চিঠিখানা পড়ে ফেললাম। কোন এক তরুণী তার দয়িতের কাছে প্রণয়-মুখর ভনিতা করে লিখেছে এক প্রেম পত্র—উপসংহারে সে অমুক কোম্পানীর হাল ফ্যাশানের লেডিজ স্যাণ্ডালের অনুরোধ জানিয়ে চিঠির সঙ্গে একখানি ক্যাসমেমো পাঠিয়েছে দোকানের ঠিকানার জন্যে।

সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত ভয় বিস্ময় এক নিমেষে উড়ে গেল মন হতে। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! এ যে জুতার দোকানের বিজ্ঞাপন! তারিফ না করে থাকতে পারলাম না। ব্ল্যাক-আউটের সন্ধ্যায় যখন কলকাতার পথে পথে গোপনতা তখন এই গোপন বিজ্ঞাপনের নবতম ধারা ছুটিয়ে দিয়ে—দেশকাল পত্রের সঙ্গে বেমালুম মিশিয়ে ফেলেছে—তার ঐ জুতার বিজ্ঞপ্তি। অবিবাহিতের কাছে এহেন বিজ্ঞাপনের নিস্ফলতা সহ্য হলো না—সেই দিনই নিয়ে গেলাম সেই জুতার দোকানে বউদিকে—একজোড়া লেডি স্যাণ্ডালের আশায়।

পাশের বাড়ীর মেয়ে

নির্মলচন্দ্র দত্ত

নতুন একটা ভাড়াটে এসেছে কলকাতা থেকে মলয়ের পাশের বাড়ীতে। মলয় একদিন রাত্রে পড়্‌ছিল তার নিজের ঘরে ব'সে। সামনে তার বি-এ পরীক্ষা। পাশের ঐ বাড়ীটার দোতালায় তখন নারীকণ্ঠে গান হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের। মলয় গানের স্বরে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল ঠিক সামনের খোলা জানালাটার দিকে একদৃষ্টে। ভেতর থেকে গায়িকার মুখটা অস্পষ্ট দেখা যায়।......

হঠাৎ মলয়ের কানে গেল ঘৃণা ও উপহাসে ভরা কথা—"কি অসভ্য ঐ লোকটা"—তারপর সশব্দে জানালাটা বন্ধ হ'য়ে গেল।

মলয় কিছু বুঝতে পারল না। সে হতভম্বের মত বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল তার অর্থহীন দৃষ্টি নিয়ে। কি দাম্ভিক প্রকৃতির ঐ মেয়েটা। ওদের দেখে দেখেই তো পুরুষ সমস্ত নারীজাতিটিকেই শ্রদ্ধা করতে ভুলে গিয়েছে। এর জন্যে দায়ী তো পুরুষ নয়, নারীই।

কয়েকদিন পরে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় মলয় বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎ একটা গলির অন্ধকারে সে দেখতে পেল', তিনটী লোক যেন একসঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। ব্যাপার কি? মলয় এগিয়ে গেল। কিন্তু গিয়ে যা দেখল তাতে সে একেবারে অবাক হ'য়ে গেল। একটা বৃহদাকার পাঞ্জাবী মুসলমান একটা মেয়ের হাত ধ'রে সজোরে টানাটানি করছে ও আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক চেষ্টাসত্ত্বেও মেয়েটাকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছেন না। মলয়ের উপস্থিতবুদ্ধি ছিল খুববেশী। সে এত-

টুকুও ইতস্ততঃ না ক'রে পাশ থেকে একটা গাছের ছোট ভাঙ্গা ডাল কুড়িয়ে পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পাঞ্জাবীটার হাতের ওপর বসিয়ে দিল। মেয়েটা রক্ষা পেল' বটে, কিন্তু সহসা লোকটা মলয়ের কপালে সজোরে একটা ঘুষি মেরে সেখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মেয়েটা কাঁপতে কাঁপতে বলল দাদা, 'উনি এসেছিলেন, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।" ভদ্রলোক বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।"

মলয় কপালটা হাত দিয়ে চেপে ধ'রে বলল "এ আমাদের কর্ত্তব্য।"

চলতে চলতে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার বাড়ী কোথায়?"

অদূরের বাড়ীটা দেখিয়ে মলয় বলল, "ঐটা"।

মেয়েটি কিসের লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লো— মুখে ব'লল ওঃ!

*　　*　　*　　*　　*

বাড়ী এসে মলয় দেখল, কপাল থেকে রক্ত গড়িয়ে প'ড়ে তার জামাটা ভিজে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ভাইকে দিয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিল। খেতে ব'সে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "আরে খোকা, তোর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন?"

"একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে মা, লেগেছে"

"কার মেয়ে?"

"কি জানি অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারি নি। আর জিজ্ঞাসা করতেও মনে ছিল না কার মেয়ে সে।"—মলয় সমস্ত ঘটনাটা তার মাকে ব'লে ফেলল।

রাত্রে মলয়ের জ্বর এসেছিল। আজ দুপুরে জ্বরটা একটু কমেছে। ডাক্তার ব'লে গিয়েছেন, "আঘাতের জন্যে জ্বর।" সে আরাম-কেদারায় শুয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা বই পড়ছিল আপন মনে।

নির্মলচন্দ্র দত্ত

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হ'ল। শব্দটা ঘরের মধ্যে এসে থামল। মলয় বই থেকে মুখ তুলে একবার চাইল। দেখল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিভরা মুখে। বয়স তার সতেরোর কাছাকাছি হবে। মেয়েটীর গায়ের রঙ খুব ফর্সা, হাত দুখানি বেশ গোলগাল দোহারা গঠন। পরণের কাপড় আঁটো-সাঁটো ক'রে পড়া। মোটের ওপর দেখতে সুশ্রী। গহনা বিশেষ গায়ে নেই—খুব আধুনিকা।

মলয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে?"

মেয়েটী উত্তর দিল "আপনাদের পাশের বাড়ীতে আমরা নতুন এসেছি, কলকাতা থেকে। আমা'র নাম কুহেলী।"

মলয় বিস্মিত হ'য়ে বলল, "ও: বসুন, বসুন"

কুহেলী সামনের চেয়ারটা টেনে ব'সে বলল "আপনি আমায় কাল খুব বাঁচিয়েছিলেন। নইলে····· উঃ!"

মলয় একটু মৃদু হেসে বলল, "ওটা মানুষের কর্ত্তব্য। মানুষের জীবনের আসল পরিচয়ই তো তার কর্ত্তব্যের মাঝে।"

"কিন্তু আপনার প্রাণ দেবতার মত। পরের জন্যে নিজের প্রাণকে"—ব্যথার সুরে কুহেলীর কথাগুলো অর্দ্ধপথেই থেমে গেল।

মলয় একটু শ্লেষের হাসি হেসে বলল······"কিন্তু একদিন তো আপনিই তাকে ঠিক এই পরিমাণই ঘৃণা করেছিলেন।

কুহেলী অত্যন্ত সংযত ও নম্র হ'য়ে বলল, "তখন আপনাকে চিনতে পারি নি। ক্ষমা চাইছি।"

মলয় চুপ ক'রে রইল। কুহেলী আবার বলল, "আপনি আমায় অশ্রদ্ধা করছেন নিশ্চয়।"—তার চোখ দুটো ছলছল ক'রে উঠলো।

মলয় উত্তর দিল, "না না, মানুষকে কোনদিন ঘৃণা করতে নেই।"

মলয়ের সঙ্গে কুহেলীর প্রথম পরিচয়ের পর প্রায় সাত আট দিন কেটে গিয়েছে।

সেদিন মলয় প্রস্তুত হচ্ছিল একটা মিটিংয়ে যোগ দেবার জন্য। গলায়চাদর। জড়িয়ে চোখে চশমাটা যেই লাগিয়েছে অমনি তার দেড় বছরের ভাইপো 'সমু' পাশের ঘর থেকে টলতে টলতে এসে তার কাপড়ের কোঁচা চেপে ধ'রে বলল, "কা—কৃ—কা"—

মলয় তাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা টুলের ওপর ব'সে আদর করছিল, এমন সময় কুহেলী সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে একেবারে কাছে এসে বলল, "ওমা, এই যে ইনিই সেদিন আমায় বাঁচিয়েছিলেন।"

এই যে ইনিই সেদিন
আমায় বাঁচিয়েছিলেন

কুহেলীর দিকে মুখ তুলে মলয় একবার চাইল। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করছেন। প্রৌঢ়াকে দেখলে মনে হয় যে উনি সত্যিই কলকাতার পরিমার্জিত সমাজেরই একজন। কুহেলীর দিকে চেয়ে মলয় একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। কুহেলীর শরীরের ওপর দিয়ে যেন
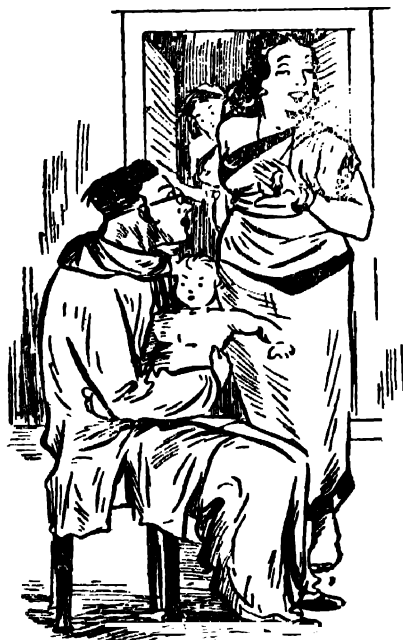
একটা বিরাট পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। মাথার চুলগুলো কিছুটা উস্কোখুস্কো, পরণের কাপড়টাও যেন ঢিলে ক'রে পরা, মুখের ওপরও যেন একটা নম্রতার ছাপ। সকল সময় সেজেগুজে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকার স্বভাবটা যেন তার কেটে গিয়েছে একেবারে।

কুহেলীর মা এগিয়ে এসে বললেন, "ও তুমি-ই মলয়? কিন্তু তোমায় যে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব! আমি কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে।"

প্রৌঢ় বললেন, "তোমার যার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলাম মলয়! তুমি বুঝি এবার বি-এ দেবে?"

মলয় শুধু বলল, "হ্যাঁ"।

তিনি আবার বললেন, "কুহেলীও তো আসছেবার ম্যাট্রিক দেবে।

কুহেলী হঠাৎ কি ভেবে কিম্বা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ব'লে উঠলো, "আমার তো মা পড়াশুনা একদম বন্ধ হ'য়েই আছে। এর কাছে কিছু কিছু পড়া দেখিয়ে নেব মা?" মেয়ের সপ্রতিভ প্রশ্নে মা সম্মতি দিলেন বেশ আনন্দের সঙ্গেই। বললেন, "বেশ তো। মলয়ের কাছে পড়বি? তাতে আর কি। আর উনি তো কলকাতাতেই থাকেন। এদিকে প্রভাসের পড়াশুনা প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায়। ভাবছি ওকে আবার এখানে ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি ক'রে দেব।"

কুহেলী বলল, "দাদার কথা ছেড়ে দাও মা। আমার পড়ার ব্যবস্থা কিন্তু করতেই হচ্ছে।"

কুহেলী ও তার মা সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

* * * * *

মানুষের জীবন তো মানুষের পরিচয়ের সাথে। মলয় ও কুহেলী

একসঙ্গে পড়তে বসেছে। কুহেলী হঠাৎ হেসে বলল, 'আমি ত আপনার ছাত্রী হলাম। আমায় আর 'আপনি' বলতে পারবেন না, এবার থেকে 'তুমি' বলতে হবে।"

হেসে মলয় বলল, 'আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু এখন তো পড়তে হয়।" কুহেলী পড়তে সুরু করলে:—

হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, আপনাকে কি ব'লে ডাকব? মাষ্টারমশাই, না মলয়দা?"

মলয় হেসে বলল, "যা খুসি।"

কুহেলী মৃদু হেসে বলল, "দুই নামেই।"

মলয় একবার তার দিকে তাকাল। কুহেলী মুখ নীচু ক'রে আবার পড়তে সুরু করল।

হঠাৎ একসময় কুহেলী প্রশ্ন করল, "আচ্ছা মাষ্টারমশাই, আপনার কপালের ঘা-টা তো শুকিয়ে গেল, কিন্তু দাগটা তো মিলাল না।"

মলয় আনমনে কপালে হাত দেয়।

মলয় হাতটা নামাতেই কুহেলী তার হাতের একটা আঙুল মলয়ের কপালের সেই দাগটার ওপর বুলিয়ে দিতে দিতে বলল "দেখুন তো, আমার জন্যে আপনার কপালের ওপর একটা কলঙ্ক রয়ে গেল।"

মলয় মৃদু হেসে বলল "ভালই তো, এই দাগটা তোমাকে আমার কাছে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে।"

"তবুও"—

"তবুও এটা যখন শুকিয়েছে তখন মিলিয়ে একদিন যাবেই কুহেলী। কিন্তু তোমার পড়াশুনা মোটেই হচ্ছে না। নাও পড়।"

একটু চুপ ক'রে থেকে মাথার দু' পাশের দু'টো বেণী সামনে থেকে পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে কুহেলী আবার পড়তে সুরু ক'রে দিল।

* * * * *

এইভাবে দিনের পর দিন যায়। এই দিন-চলার সাথে সাথে মানুষের জীবনও চলে এগিয়ে বাস্তবের সুখ দুঃখের মাঝখান দিয়ে। মানুষের জীবনের এই ওঠা-নামা নিয়েই তো বাস্তবের সত্যকারের রূপ।

সেদিন রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নাময়ী। চাঁদ অকৃপণভাবে ঢেলে দিয়েছে তার অজস্র আলোর কিরণরাশি। মানুষের মন যেন সহসা আনন্দের রসে হ'য়ে ওঠে ভরপুর। বাগান থেকে ভেসে আসছিল নাম-না-জানা সুন্দর একটী ফুলের গন্ধ। মলয় বাড়ী ফিরছিল ত্রস্তপদে। রাত হয়েছে অনেক।

ঘরে ঢুকেই দেখে তার টেবিলের নিজের ফটোটার সামনে মাথা রেখে কে টেবিলের ওপর পড়ে আছে। তার খোলা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।...টেবিলের কাছে আসতেই মুখ তুলল যে সে কুহেলী। মলয় একবার তাকিয়ে দেখল কুহেলীর দিকে—প্রশ্ন করল, "আচ্ছা তো কুহেলী তুমি এখনও পড়তে বস নি ?"

সে কথার জবাব দিল না কুহেলী—চেয়ে রইল উদাস দৃষ্টিতে, তারপর হঠাৎ এক সময় সে ব'লে উঠল "মলয়দা"।

মলয় অন্যদিকেই তাকিয়ে উত্তর দিল "কি ?"

কুহেলী কোন জবাব দিল না – বই খুলে পড়তে ব'সে গেল।

হঠাৎ কুহেলী বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, "আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, আপনার মত ঠিক একটী লোককে বিয়ে করতে।"

মলয় হেসে বলল 'তবে আমার মত একটী লোক খুঁজতে হয়

দেখছি।” একটু পরে গম্ভীর হ'য়ে আবার বলল, “কিন্তু আমার মত লোককে তো তোমার মা বাবা খুজবেন না, তাঁরা তোমাকে যে ভাবে মানুষ ক'রে তুলেছেন তাতে তাঁরা নিশ্চয়ই খুজছেন, একজন বিলাত ফেরৎ আই-সি এস্ জামাই যিনি বিলাসিতার আবহাওয়ায় সাহেবদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে—”

কুহেলী বাধা দিয়ে বল্‌ল, “না, না, ওদের মত লোককে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌ব না। ওদের জীবন আছে কিন্তু প্রাণ নেই, ওদের ভালবাসা আছে কিন্তু শ্রদ্ধা বা স্নেহ নেই, ওরা মানুষ বটে কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই। ওরা আমাদের ভালবাসে কিন্তু কোনদিন দরদ দিয়ে অনুভব ক'রে দেখে না। ··ওদের কাছে আমাদের হৃদয় যেন অর্থহীন। আমাদের জীবন নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলতে ভালবাসে—”

মলয় কথার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্মে চেষ্টা করে, “যাকগে ওসব কথা—কিন্তু কুহেলী—কোনদিন এত সুন্দর দেখি নি তোমায়।”

কুহেলী কোন উত্তর দিতে পারে না—চেয়ে থাকে মলয়ের দিকে।

* * * * *

মানুষের জীবনের সকল অস্তিত্ব টেনে নিয়ে দিন আবার এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। প্রায় ছ'টা মাস কেটে গিয়েছে। কত জীবনে এরই মধ্যে হয়ত কত বিভিন্ন রকমের পরিবর্ত্তন হয়েছে কে জানে!

সেদিন মলয় পড়ছিল তার নিজের ঘরে। কুহেলী এল' অনেক দেরী ক'রে। কুহেলী ঘরে ঢুকতেই মলয় বলল “মানুষের জীবনে দুঃখ আসে কেন, জান কুহেলী?”

ম্লানমুখে কুহেলী জিজ্ঞাসা করে, “কেন?”

“জীবনের প্রসারলাভ মানুষ করতে পারে না ব'লে।”

বাধা দিয়ে কুহেলী বলল—"সে কথা যাক! কিন্তু মলয়দা—"

সে কেঁদে ফেলল। বলল, "বাবা কালই আমাদের নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। বাবার আর ছুটী নেই। পরশুই আবার কাজে জয়েন করতে হবে ...তাই আবার আমাদের কল্‌কাতায় বাড়ীতেই ফিরে যেতে হচ্ছে।"

"ও!"—মলয় অন্যমনস্কভাবে বলল।

"কি হবে মলয়দা?"

"কি আবার হবে?...ছিঃ কেঁদো না লক্ষ্মীটী"—ব'লেই সে কুহেলীর একটা চুল মুখের ওপর থেকে মাথার ওপর তুলে দিল।

কুহেলী ডাকল, "মলয়দা—"

"কি?"

"আমি কিন্তু যাব না।"

"ছিঃ লক্ষ্মীটী ও কথা ব'লো না। তোমার মা বাবা তা হ'লে কি বলবেন বল তো!"—একটু ভেবে সে আবার বলল, "কিন্তু এর প্রতিকারও তো কিছু নেই। জানই তো, তোমার বাবা আমার হাতে তোমাকে দিতে রাজী হন্ নি। তিনি তোমার বিয়ে দেবেন আমার চেয়ে অনেক বড়লোকের ঘরে, আমার চেয়েও অনেক ভাল ছেলের হাতে।"

"কিন্তু আমি তো বড়লোক স্বামী চাই না।" কুহেলীর চোখের দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো গাল ব'য়ে টেবিলের ওপর।

অনেকক্ষণ উভয়ে নীরব। সহসা কুহেলী ডাকলো "মলয়দা!"

সে উত্তর দিল না—তারও চোখ দুটি মুক্তার মতই টলটল করছিল।

* * * * *

তারপর অনেকদিন কেটেছে। সে প্রায় বছর তিন চার হবে। জগতের কর্ম্মকোলাহলের মাঝ দিয়ে দিন অতিবাহিত হয়। তারই মাঝে মলয়ের জীবন ঠিক একইভাবে এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে মনে হয় তার অনেকদিন আগের একটী ছোট্ট, অথচ খুব উজ্জ্বল ঘটনা।···কুহেলীরা আজ কতদিন চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন সে কোথায় আছে, কি রকম আছে, কে জানে? তার মলয়দার কথা কি তার কোনদিন মনে পড়ে না? ·····

একদিন মলয় চলেছে তার কি একটা জরুরী কাজে কোন এক গ্রামের দিকে। সেটা বর্ষার রাত্রি। তার গরুর গাড়ী চলেছে অনেক কষ্টে ধিকিয়ে ধিকিয়ে। মেঠো রাস্তা। খানিকটা আগে বৃষ্টি হ'য়ে গিয়ে এখন থেমেছে। মাঠের মাঝে মাঝে জল জমে বেশ—কাদাও হয়েছে। গাড়ীর নীচের লণ্ঠনের মৃদু আলোয় বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। গাড়োয়ানের নির্দ্দিষ্ট পথে গাড়ী চলেছে··ধীরে—অতি ধীরে—অনেক কষ্টে এগিয়ে। ···খানিক পরে গাড়ীটা এসে থেমে গেল পথের ওপর আর একটা গাড়ীর সামনে। সামনের গাড়ীটার চাকা কাদায় গিয়েছে পুঁতে। গাড়োয়ান মোষ দুটোকে নির্ম্মম প্রহারের পরেও এক ইঞ্চি পরিমাণও গাড়ী নড়াতে পারল না।

সঙ্কট অবস্থা দেখে খানিকক্ষণ পর মলয় তার গাড়োয়ানকে গাড়ীটা নামাতে ব'লে জিজ্ঞাসা করল, "কে আছেন ও গাড়ীতে?" গাড়ীটার সামনের দিক থেকে যিনি উত্তর দিলেন. তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ ভদ্রোচিত. "বড় বিপদে পড়েছি মশাই। সকালের ট্রেণটা ধরতেই হবে। নতুবা—"

"তবু রাত্রে বেরুনোটা ভাল হয় নি।" মলয় বলল।

"কি করি মশাই। যে বর্ষাকাল··তাতে আবার স্ত্রী পুত্র সঙ্গে

নিয়ে···আজ দুপুরের মধ্যে কোলকাতায় না পৌছুলে বাবাকেও বোধ হয় আর শেষ দেখা দেখতে পাব না।”

মলয় ব্যাপারটা এক নিমেষে বুঝে নিল। আর কোন কথা না ব'লে মলয় গাড়ী থেকে নেমে এ গাড়ীর কাছে এসে দেখল যে একজন ভদ্রলোক গাড়ীর ওপর ব'সে আছেন। তার শিশুপুত্রকে মৃদু তিরস্কার করার স্বরে বোঝা গেল যে একজন স্ত্রীলোকও আছেন গাড়ীর মধ্যে। তারপর মলয় তার নিজের গাড়োয়ানকে ও অপর গাড়ীর গাড়োয়ানকে চাকা দুটো ঠেলতে ব'লে নিজে গাড়ীর সম্মুখ দিকটা ধ'রে টানতে লাগল

ভদ্রলোকটী একবার আপত্তি জানালেন। মলয় কোন আপত্তি শুনল না। বাধ্য হ'য়ে ভদ্রলোকটীকেও নামতে হ'ল। সেই কর্দ্দমাক্ত পিছল পথে তিন জনে মিলে অনেক কষ্টে গাড়ীটাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেল খানিকটা। হঠাৎ মলয় পা পিছলে প'ড়ে গেল মাটীতে—মোষ তার পা দু'টো মলয়ের বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়ে গাড়ী টেনে চ'লে গেল।··একটা চাকাও তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে পার হ'য়ে গেল।

গাড়োয়ানটা চিৎকার ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, “ও কর্ত্তাবাবু সর্ব্বনাশ হইছে বাবু বুঝি গ্যালান।”

মলয়ের গাড়ীর গাড়োয়ান ছুটে এসে গাড়ী থামাল।

মলয়কে প'ড়ে যেতে দেখে জমিদারবাবু তাড়াতাড়ি একটা আলো নিয়ে এসে মুখের ওপর তুলে ধ'রে একেবারে হতবাক্ হ'য়ে গেলেন—কি করবেন ভেবে পেলেন না।··

······সকলে মিলে যখন ধরাধরি ক'রে মলয়কে গাড়ীতে তোলা

হ'ল তখন তার জীবনের চলার পথ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। হঠাৎ পথের মাঝে এত বড় একটা দুর্ঘটনা হবে তা ত কেউই ধারণা করতে পারেনি। সকলেই কেমন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ল। স্ত্রীলোকটী একটু এগিয়ে এসে লণ্ঠনের আলোতে একবার ভাল ক'রে দেখে চমকে উঠল, "এ কে? মলয়দা যে?"·· তারপর তার কর্দ্দমাক্ত মাথাটী নিজের কোলে সযত্নে তুলে নিল। জমিদার বাবু একবার চাইলেন হতভম্বের মত।

স্ত্রীলোকটী ডাকল, "মলয়দা — আপনি—" ব'লেই কেঁদে ফেলল।

অসহায়ভাবে একবার চোখ খুলে তার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে মলয় বলল, "কে? কুহেলী—তুমি?"···একটু থেমে আবার বল্‌ল, "আমি ভাবতেও পারিনি কুহেলী, মৃত্যুর সময় তোমার দেখা পাব।" আরও একটু থেমে বল্‌ল, "কুহেলী তুমি—"

বাধা দিয়ে কুহেলী রুদ্ধ কাতরকণ্ঠে বল্‌ল, "কে জানত মলয় দা, এমন ক'রে এখানে এভাবে আমিই আপনার এত বড় দুর্ঘটনার কারণ হব। এভাবে আপনাকে আমি যেতে দেব না। এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে আপনি জন্মের মত আমাকে অপরাধী ক'রে যেতে পারেন না"—অশ্রুভারে কুহেলীর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল।

কিন্তু যেতে দিতে হল। মলয় কুহেলীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

নির্জ্জন রাত্রির ছম্‌ছমে গভীরতা ভেদ ক'রে একটা নিশাচর বিরাটাকায় পাখী পাখার ঝাপটের সঙ্গে কর্কশকণ্ঠে ডাক্‌তে ডাক্‌তে উড়ে গেল।

কাব্যের ভূমিকা

ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী

দার্জ্জিলিং মেইল ছাড়ে রাত্রি নয়টারও পরে, সোমনাথ কিন্তু ঠিক নয়টা বাজিতে না বাজিতেই বাড়ী হইতে বাহির হইল এবং সোজা ষ্টেশনে আসিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট কাটিয়া একেবারে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া যেন একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বিবাহের পর সোমনাথের এই প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাত্রা। বলা বাহুল্য নবোঢ়া পত্নী মঞ্জুলেখা তার বাবার কাছে দার্জ্জিলিংএই আছে।

সোমনাথ দীর্ঘ চারি পৃষ্ঠাব্যাপী এক চিঠি লিখিয়া তিন চার দিন আগেই মঞ্জুকে তার দার্জ্জিলিঙ যাত্রার সংবাদটা দিয়া রাখিয়াছে এবং সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজি কোটেশন কণ্টকিত চিঠি খানার উপসংহার করিয়াছে এইভাবে—

ঠিক পূর্ণিমার দিন আমি পৌঁছিব এবং পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-লোকে গিরিশিখরের কোন এক নিভৃত নিকুঞ্জে আমরা আমাদের প্রথম মধু যামিনী যাপন করিব।

তুমি—মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে,
কুঞ্জ কাননে সুখে,
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা
ধরিবে আমার মুখে।

তুমি চেয়ে মোর আঁখি-পরে
ধীরে পত্র লইবে করে,
হেসে করাইবে পান চুম্বন ভরা
সরস বিম্বাধরে।

ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রাত্রে ও প্রভাতে কবিতার প্রথম অংশটি আবশ্যক কিছু কিছু রূপান্তরিত করিয়া সুদীর্ঘ পত্র কাব্যখানা সমাপ্ত করিয়াছে।

পত্র খানা পাঠাইয়া দিয়া সোমনাথ এই কয়েকদিন কেবল উন্মনা হইয়া ফিরিয়াছে, খণ্ডিত স্বপ্নের আবর্ত্তে অনবরত ঘুর-পাক্ খাইয়া চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙ এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনগুলি তার প্রায় কণ্ঠস্থ, কোন ষ্টেশনে কতক্ষণ গাড়ী থামে টাইমটেব্‌ল না দেখিয়াই এখন সে বলিতে পারে। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙের দূরত্ব প্রায় তিনশ সত্তর মাইল—এই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করিতে গাড়ীখানা ঘণ্টায় কয় মাইল যাইবে তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত সে কাগজে কলমে রাখিয়াছে। মোট কথা দার্জ্জিলিঙ যাত্রা পথের বিবরণ অনবরত পড়িতে পড়িতে টাইমটেবলটা প্রায় ছিঁড়িয়াই গিয়াছে এবং ছিন্ন কাগজের ফাঁকে ফাঁকে এই দীর্ঘ লৌহাবর্ত্তের শেষ প্রান্তবর্ত্তী দার্জ্জিলিঙ শৈলের অপরূপরূপটাও কোন কোন রাত্রে তার স্বপ্নময় চোখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। সোমনাথ কখনো দার্জ্জিলিঙ যায় নাই অথচ পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কয়দিনের মধ্যেই

গোটা দার্জ্জিলিঙ পাহাড়টাই তাহার একান্ত পরিচিত হইয়া গিয়াছে। তুষারমৌলিগিরিশিখরশ্রেণী, তরুচ্ছায়া ঘন দুর্গম বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ, পর্ব্বতগাত্রোচ্ছিন্ন স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণীর জলধারার বিপুল সমারোহ, শীকরশীতল গুহাগৃহ, শস্পশ্যামল উপত্যকাভূমি—যেন সে জীবনে কতবার দেখিয়া আসিয়াছে তার ঠিক নাই। প্রকৃতির এই অজস্র ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে—এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে মঞ্জুলেখা সোমনাথের কাছে বারে বারে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নববিবাহিতের প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাত্রার মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা আছে। এই উত্তেজনার রূপ নাই, গতি আছে—দেহের প্রতি শিরায় উপশিরায় এই চঞ্চল, উচ্ছল, উদ্বেল গতিবেগ কি নিবিড় উন্মাদনার এক অননুভূত মাধুর্য্যরসে উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিয়া জাগ্রত জীবনকে মদির মধুর স্বপ্নময় করিয়া তোলে।

সোমনাথের দোষ নাই এবং সে ঠিক করিয়াছে আজ রাত্রিটা সম্পূর্ণ জাগিয়াই কাটাইয়া দিবে। গাড়ী ছুটিয়া চলিতেছে—তাহার ও মঞ্জুলেখার মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে—এই যে চিন্তা ইহার মধ্যে ভাসিয়া আসে কোন্ সুদূর হইতে একটু মৃদু মধুর মদির চুলের গন্ধ, জাগিয়া উঠে সুগভীর আবেগ-ভরা একখানি সুন্দর বদনকমল, আলগোছে অন্তরকে স্পর্শ করিয়া যায় নব যৌবনোদ্ভিন্না প্রেয়সী তরুণীর তপ্ত দেহসৌরভ,

বাজিয়া উঠে অদৃশ্য জীবন-বীনায় কমকাঁকনের কণকণধ্বনির একটানা অশ্রান্ত রাগিণী।

সোমনাথ বুকপকেট হইতে সুরভিত সিল্কের রুমালটা বাহির করিয়া মুখটা মুছিয়া লইল. ছোট্ট একটা আয়না বাহির করিয়া চুলটা আর একবার ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া লইল এবং একটা সিগারেট ধরাইয়া একখানা মোটা বই বাহির করিয়া পড়িতে মনোনিবেশ করিল।

মিনিটখানিক মাত্র। বইটা রাখিয়া দিয়া সোমনাথ একবার সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্ল্যাটফরমে যাত্রী সমাগম সুরু হইয়াছে। অত্যাবশ্যক কর্ম্মব্যস্ততায় ও প্রচুর হাকডাকে, চলন্ত বোঝার বিপুল সঞ্চরণে ষ্টেশন সরগরম। কাব্য করিয়া বলিলে-বলিতে হয়—এ যেন আলস্যের আকাস্মিক জাগরণ। আধুনিক প্রাচ্যরীতি অনুযায়ী এমন একটা ষ্টেশনের একখানি ছবি আঁকিয়া তার নীচে পরিচিতি লেখা চলিতে পারে—কুম্ভকর্ণের জাগরণ। ঘুম হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া ত্রেতাযুগের মহাবীর কুম্ভকর্ণ লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড সুরু করিয়া দিয়াছিল, ভাগ্যে সে বীরত্ব বর্ণনার ভার কবির হাতেই পড়িয়াছিল তাই রামায়ণ পড়িতে পড়িতে অনেকেই এখনও ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠেন। কবিরাই যুগে যুগে সনাতন ভারতবর্ষের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাই সুপ্তোত্থিতের দাপাদাপির মত অতি হাস্যকর ব্যাপারটাও বর্ত্তমান যুগে

চাতুর্য্য ও ক্ষিপ্রতার পর্য্যায় পড়িয়া সকলের সমান বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে।

প্ল্যাটফরমের বড় ঘড়িটার দিকে সোমনাথের হঠাৎ নজর পড়ে। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। গাড়ী ছাড়িতে আর মাত্র বার মিনিট বাকী। মনটা তার হঠাৎ ধবক্ করিয়া উঠে। গাড়ী এখনিই ছাড়িয়া দিবে। একটা অনির্ব্বচনীয় পুলকরসে তার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া শিহরিয়া কম্পিত দীপশিখার মত কাঁপিতে থাকে। কোন্ এক অজ্ঞাত মায়াদণ্ডে অন্তরের ক্ষীরসমুদ্রে চলে অবিরাম মন্থন!

সোমনাথ নিজের স্থানে ফিরিয়া আসিয়া টাইমটেবলটা আর একবার খুলিয়া দেখে—হ্যাঁ ঠিক নয়টা বারমিনিটে গাড়ী ছাড়িবে। তার সোণার হাত ঘড়িটায় নয়টা তিন। আর নয় মিনিট। সে আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া পিছনের গদীতে হেলান দিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে এলাইয়া পড়ে। গাড়ীর এই কামরায় এখনো কেহ উঠে নাই—সুদীর্ঘ তিনশ উনসত্তর মাইল গাড়ীখানা একটানা চলিবে। দুই একজন উঠিলে মন্দই বা কি? বেশ গল্পগুজবে রাত্রিটা কাটাইয়া দিতে পারা যায়! হয়ত তাদের কাছে দার্জ্জিলিঙ এর কত নূতন নূতন খবর পাওয়া যাইবে. না থাক—এই ভালো। সোমনাথ আবার হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায় মিনিটের কাঁটা যেন ঘণ্টার কাঁটার মত চলিতেছে—রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে—

"চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে"—রবীন্দ্রনাথ? সোমনাথ

কামরার মধ্যে পায়চারি করিয়া আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করে—

…তুমি মোরে করেছ সম্রাট।
তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট।
পুষ্পডোরে সাজায়েছ কণ্ঠ মোর, তব রাজটীকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি।—

আবৃত্তি করিতে করিতে সোমনাথের মন লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মত কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া যায়—কত গিরিকান্তার কত বন-প্রান্তর কত নদনদী পার হইয়া কোথায় ছুটিয়া চলে। তাহার মনে হয় কে যেন তাহাকে কতদূর হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। কি মোহময় কি মধুর সে ডাক—হৃদয়তন্ত্রীতে তাহা যেন রণিয়া রণিয়া বাজিতেছে।

সোমনাথ ভাল করিয়া কাণ পাতিয়া শুনে—তার আচ্ছন্ন আবেশ নিমেষে ঘুচিয়া যায়। সত্যই বাহির হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। মুখ ফিরাইয়া সোমনাথ চাহিয়া দেখে একজন সুবেশা মহিলা বাহিরে দাঁড়াইয়া কামরাটার দরোজা খুলিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে এবং অতি ত্রস্তকণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছে—দেখুন দয়া করে দোরটা একবার খুলুন না?

সোমনাথ দরোজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণও চলিতে আরম্ভ করিল। মহিলাটি গাড়ীতে উঠিতেই লজ্জিত কণ্ঠে সোমনাথ বলিল—ক্ষমা করবেন, আমি ইচ্ছে করে

আপনাকে কষ্ট দিইনি। আপনি বোধ হয় অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ?

নবাগতা জবাব দিল—না। বরঞ্চ আপনিই আমার ধন্যবাদের পাত্র। আপনি দোর না খুলে দিলে আমি কিছুতেই গাড়ীতে উঠতে পারতুম না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

—দার্জ্জিলিঙে।

—আপনি ?

—সান্তাহার।

সোমনাথ মহাখুসী হইয়া বলিল—ভালোই হল। অনেক দূর একসঙ্গে যাওয়া যাবে। গাড়ীর কামরায় একমেবদ্বিতীয়ং অবস্থাটা খুবই আরামজনক বলে আমি মনে করিনে।

মহিলাটি হাসিতে হাসিতে হাতের এটাচি কেসটা সোমনাথের কেসটার কাছেই রাখিয়া দিয়া বলিল—এইখানেই বসি—বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

বেশ ত বসুন না। নিঃশঙ্কচিত্তে বসুন। আমাদের মাঝখানে ব্যাগের ব্যবধান ত রইলই।

সোমনাথ হাসিল এবং মনে মনে ভাবিল মন্দ নয়। মহিলাটির এই আকস্মিক আবির্ভাব রজনীর প্রথম যামে নির্জ্জন রেলের কামরায় তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমন—আগামী মধুরজনীর মধুর কাব্যের এ যেন একটি ক্ষুদ্র অথচ মনোহর ভূমিকা।

বৈদ্যুতিক আলোর তীব্র ও তীক্ষ্ণ জ্যোতিতে মহিলাটির বয়স

অনুমান করা শক্ত! কিন্তু তাঁহার লিপষ্টিক রঞ্জিত ঠোঁট রুজ পাউডার গঞ্জিত গালদুইটী সোমনাথকে অতি মাত্রায় বিহ্বল করিয়া তুলিল। উচ্চগ্রামে বাঁধা মনের সেতার বাহিরের একটু মৃদুমন্দ আঘাতেই অস্ফুট সুরের কলগুঞ্জনে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে—জ্যোৎস্নার বিপুল প্লাবনকে দলিত মথিত করিয়া, ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া, মাঠ গাছপালা নদী নালা অতিক্রম করিয়া।

সোমনাথের কাছাকাছি বসিয়া মহিলাটি বলিল—দেখুন মানুষের মনটাই আসল, বাইরের শাসনটা—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সোমনাথ ছদ্মগাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—নকল এইত? কিন্তু জানেন, আজকাল আসলের চাইতে নকলের দাম বেশী। মুখের চাইতে মুখোস বড়।

মহিলাটি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল—এ আপনার অতিশয়োক্তি। এতখানি অতি রঞ্জনে আমি রাজী নই।

সোমনাথ বলিল—ক্ষমা করবেন। আমি কাব্যও লিখছিনে, বক্তৃতাও দিচ্ছিনে। অতি ভাষণ আর অতিরঞ্জন আমার পেশা নয়। আজকের রাত্রির আমাদের অবস্থাটাই মনে করুন। কেউ কাকে চিনি নে। অথচ যাচ্ছি গাড়ীর একই কামরায়। এই সহযাত্রার রূপটা যদি বিকৃতই হয়ে লোকের চোখে দুলিয়ে ওঠে তা'হলে সেটাই ত হবে স্বাভাবিক। অর্থাৎ বাইরের রূপটাই হবে আসল।

বুকের কাছাকাছি হইতে একটি সুবাসিত রঙীন রুমাল বাহির করিয়া মুখখানা মুছিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া নবাগতা জবাব দিল—সত্যি। আজ রাত্তিরে এমন ভাবে আমাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হবে, এ আমরা বোধ হয় কোন দিন কল্পনাও করিনি।

অবশ্য সোমনাথও কল্পনা করে নাই। এমন যাত্রার মধ্যে আনন্দ আছে।

সোমনাথ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মহিলাটির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল তবুও ত কেউ আমরা কাউকে চিনিনে—আর খানিকক্ষণ পরেই হবে দু'জনের ছাড়াছাড়ি, রাত্রি প্রভাতে থাকবে শুধু একটা স্বপ্নের স্মৃতি। মহিলাটী হাসিয়া বলিল—ক্ষতি কি? কোন অজানা ফুলের আচমকা গন্ধেই ত আমরা উঠি চমকে। এই আকস্মিক চমক মনকে দেয় নাড়া—অতি পরিচিত ফুলকে ত আমরা ভুলেই থাকি : সোমনাথ বলিল—অথচ এই ফুল নিয়েই আমাদের কারবার। ধরণীর ধূলায় যাদের বাস তারা কাব্যের ছন্দে জীবনকে চালাতে পারে না।

—কিন্তু কেবল ধুলোবালি মাখলেই কি জীবনের আসল পরিচয় পাওয়া যায়?

—হয়ত পাওয়া যায় না। কিন্তু সে দোষ ধূলো বালির নয়—দোষ মানুষের। জল ঘুলিয়ে দিলে যে পাঁক উঠে এ ত সবাই জানে!

মহিলাটি হাসিয়া বলিল—কথায় আপনার সঙ্গে পারবার যো নেই। ধরুন আমি যদি আপনার সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ অবধি যাই!

দার্জ্জিলিঙ আমি কখন দেখিনি দেখবার লোভ আছে। আপনি ত সেখানে বেড়াতেই যাচ্ছেন।

সোমনাথ সত্য কথাটা একেবারে গোপন করিয়া বলিল—নিশ্চয়ই। আপনি গেলে কোথায় ওঠবেন?

—আমার মামা থাকেন সেখানে, কল্পাখানিক বাদেই সেখানেই যাব—ঠিক করেছিলুম। এখন ভাবছি মাঝ পথে না নেমে আপনার সঙ্গেই চলে যাই।

সোমনাথ উল্লাসে অধীর হইয়া বলিল—বেশ ত চলুন না। একটা কথা জিগ্‌গেষ করব? মাফ করবেন।

—স্বচ্ছন্দে বলুন।

সোমনাথ বলিল—দেখুন, আমরা এক সঙ্গে যাচ্ছি অথচ কেউ কারো নাম জানিনে।

পরিচয় হইতে অবশ্য বেশী দেরী হইল না এবং দেখা গেল নাম জানাজানির পর দুই জন আরো কাছাকাছি আসিয়া বসিয়াছে। ট্রেণ ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাহিরের দলিত মথিত উৎক্ষিপ্ত বাতাস জানালা দিয়া সজোরে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, হাওয়ায় উড়িয়া উড়িয়া গীতা-দেবীর বস্ত্রাঞ্চল সোমনাথকে বারে বারে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে, তাহার অনাবৃত বাহুলতার ললিত ভঙ্গিতে সোমনাথের মন যেন আবেশে লুটাইয়া পড়িতেছে। গীতা দেবীর মনোহর মোহময় চক্ষে কি গভীর আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সোমনাথ গীতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। দুইজনের চোখে চোখ মিলিয়া যায়। অকারণেই দুজনের মুখে মৃদু হাসির রেখা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। দুই জনেই চুপ করিয়া যায়। এ যেন মনে মনে লুকোচুরি খেলা। গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। চুপচাপ থাকিবার পর শুষ্ককণ্ঠে সোমনাথ বলিল—তা হলে আপনি মত বদলালেন বলুন? গীতা দেবী উত্তর দিল—প্রায়। তবে শাস্তাহারে পৌঁছে আমার সিদ্ধান্ত জানাবো। সোমনাথ হাসিয়া বলিল—মনস্থির এখনি করে ফেলুন গীতা দেবী। শুভস্য শীঘ্রম্। কাল আর জীবন এ দুটোর কোনটা কেই বিশ্বাস নেই। সোমনাথের কথার ভঙ্গিতে গীতা দেবীও হাসিল, বলিল—সত্যি, যদি হঠাৎ রেলটা উল্টে চুরমার হয়েই যায়!

—আশ্চর্য্য কি। কিছুই ত বলা যায় না, বেশ, আপাততঃ না হয় মেনে নিলুম শেষ পর্য্যন্ত আপনি দার্জ্জিলিঙেই যাচ্ছেন। সুতরাং এই দীর্ঘ পথ জেগে না গিয়ে একবার ঘুমুবার চেষ্টা করুন। গীতা দেবী উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কেন বলুন তো? আর শোবই বা কোথায়? সোমনাথ উত্তর দিল—কেন ঐ নীচের বার্থটায়। আমার সঙ্গে চাদর আছে আর এই ব্যাগটা হবে বালিশ। মন্দ হবে না।

—আর আপনি?

—আমি জেগে জেগে আপনাকে দেব পাহারা

সোমনাথের কথা শুনিয়া গীতা দেবী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল;

বলিল—আপনি পাহারা দেবেন? কিন্তু মজুরী দেবার শক্তি ত আমার নেই। —নাইবা দিলেন মজুরী। যক্ষ কুবেরের ঐশ্বর্য্য-পাহারা দেয় কিসের লোভে? নিশ্চয় মজুরীর লোভে নয়।

সোমনাথের কথা শুনিয়া গীতা দেবীর মনোলোকে কত বড় ভূমিকম্প হইয়া গেল, এবং তাহার ফলে তাহার কতখানি মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল বাহির হইতে বুঝা গেল না কিন্তু সে হাসি মুখেই বলিল—বেশ, পাহারা দেবেন পাহাড়ে গিয়ে। এখন নয়। আমি ঘুমুবো আর আপনি থাকবেন জেগে—এ হয় না। বরঞ্চ এই বেশ, দুজনে কেবল কথার মালা গেঁথে যাত্রা পথে দেব পাড়ি।

হঠাৎ সোমনাথ এক কাণ্ড করিয়া বসিল। ফস্ করিয়া গীতাদেবীর ডান হাতখানি টানিয়া ধরিয়া সে আবেগ ভরা কণ্ঠে বলিল—উঠুন ত। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সোমনাথের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল—মনে হইল যেন নিখিল বিশ্বের সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ তাহার দেহ-যন্ত্রের মধ্যে অকস্মাৎ সঞ্চারিত হইয়া, আজকার রাত্রির এই নির্জ্জন রেলের কক্ষ, বাহিরের জ্যোৎস্না রাত্রি, সকটচক্রের কঠোর কঠিন ধ্বনি—সর্ব্ব-পার এই সুমনোহর পরিবেশ—সব কিছুরই ঊর্দ্ধে তাহাকে একেবারে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কোন এক মায়ালোকের কুসুম কোমল সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। একটা নীরব নিবিড় মাদকতার অলস আবেষ্টনে সে যেন এলাইয়া পড়িয়াছে।

সোমনাথ গীতা দেবীর হাতখানি ছাড়িয়া দিল। অপরপক্ষ

হইতে না আসিল কোন অভিযোগ, না আসিল কোন অভিনন্দন।

দুইজনই চুপচাপ করিয়া রহিল। গাড়ী আসিয়া শাস্তাহার ষ্টেশনে থামিল। গীতা দেবী তাড়াতাড়ি সোমনাথকে বলিল: দয়া করে দেখুন ত ষ্টেশনে বারীন বলে কেউ এসেছে কিনা? গেটের কাছে তার দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। নাম ধরে ডাকলেই সাড়া দেবে।

সোমনাথ গাড়ী হইতে নামিতে উদ্যত হইয়া গীতা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল—দার্জিলিঙের টিকিট? গীতা দেবী জবাব দিল—বড় লোভী ত আপনি! আগে খবরটাই নিন। গাড়ী এখানে থামে দশ মিনিট। টিকিট করবার সময় পাওয়া যাবে।

হাসিয়া সোমনাথ অতি দ্রুতবেগে গাড়ী হইতে নামিয়া প্ল্যাটফর্মে চলিতে চলিতে যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। মিনিট সাতেক পরে সোমনাথ হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া গাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দেখে—কক্ষটি খালি—গীতা দেবী নাই—শুধু একটা এটাচি কেস পড়িয়া আছে। সোমনাথ শিথিল পদে গাড়ীতে উঠিয়া দেখে ব্যাগটার উপরে একখানা ক্ষুদ্র কাগজ। কম্পিত হস্তে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া সোমনাথ পড়িল—

খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে হলো। দেখা হলো না। হয়ত একদিন হবে। আশা করি এই যাত্রাপথের কথা কেউ আমরা সহজে ভুলবো না। পথের পরিচিতা "গীতাদেবী"—

হঠাৎ ব্যাগটার পর তার নজর পড়িল। একি, এ ব্যাগ ত

সোমনাথের নয়। তবে কি ভুল করিয়া গীতা দেবী তাহার ব্যাগটাই লইয়া গিয়াছে।

সোমনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে যেন চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল—তাহার টাকা কড়ি জিনিষপত্র—এমনকি ট্রেণের টিকিটটা পর্য্যন্ত ঐ ব্যাগের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে।

বিপদ কখনও একা আসে না। যখন সে এই অচিন্তনীয় ব্যাপারটার বিষয় চিন্তা করিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না ঠিক এমনি সময়ে ক্রুম্যান গাড়ীতে উঠিয়া অতি বিনয় সহকারে তাহার টিকিটখানা চাহিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং নির্দ্দয় নিষ্করুণ ক্রুম্যান অতি প্রশান্ত সহাস্যে বারে বারে টিকিট চাহিয়া সোমনাথের লজ্জাকে গভীর হইতে গভীরতর করিয়া তুলিতে লাগিল। গাড়ী আসিয়া পার্ব্বতীপুর থামিল।

* * * * *

বলা বাহুল্য সোমনাথ টিকিট না করিবার সন্তোষজনক হেতু দেখাইতে পারে নাই এবং তাহার অদ্ভুত বিবরণ কেহ বিশ্বাসও করে নাই। ফলে সেই গভীর রাত্রে পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনের ক্ষুদ্র বায়ুলেশহীন পুলিশ কারাকক্ষের ছিন্ন কম্বলে শুইয়া হৃতসর্ব্বস্ব সোমনাথ দার্জ্জিলিঙের মধুযামিনীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

শনিবাসর

নন্দগোপাল পাঠক

ওকালতিটা নাকি হাতের পাঁচ। কর্ত্তারা ত' তাই বলেন। ওটা পাশ ক'রে রাখাই ভাল। শুধু শুধু এম, এ, পড়াটা কোন কাজের কথা নয়। দুটো বছর ক'লকাতায় ত' রাখতেই হবে—মরুগ্ গে—দূর কর ছাই, নিয়ে দিয়ে আর একটা বছর বইত নয়। যেমন ক'রেই হোক চ'লে যাবে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। তবু পাশটা করা থাকলে আর কিছু হোক আর নাই হোক দুটো চাট্টে বাঁধা মরত' জুটবেই। তা ছাড়া জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার ল-এজেণ্ট এগুলো ত' হাতেই থাকল। ওপর আদালতে হাস্তমুখ তেমন না চলে দুখানা ওকালতনামা সই ক'রেও পেটের ভাত দিব্যি ড্যাংডেঙিয়ে হ'য়ে যাবে। তা ছাড়া মুন্সেফবাবুর টেবিলে খাবা মারার কথা না হয় বাদই দিলাম। আর বাদ না দিয়েই বা উপায় কি? উকিলবাবুদের অত্যাচারে দেরাজগুলো সব খাঁটি শাল দিয়ে তৈরী ক'রে দিয়েছে। যখনই কাট তখনই আঠা। বছর বছর আর বদলাবার দরকার হবে না। ঘুঁষি মারলে ঘুঁষি ফিরে আসে। হাত শানিয়ে যাও। তুমিও যেমন—ভাল দেখেচ—বলি দেশের জমিদারগুলো এখনও উজাড় হ'য়ে যায়নি যে এত ভাবতে হবে?

ওটা ভায়া বোঝবার ভুল। জমিদার ব'লতে কি আর কেউ আছে? তাদেরও সব শিরে সন্নিপাত। নইলে কি উকিলবাবুরা বারলাইব্রেরী ছেড়ে সব বটতলা চড়াও ক'রেছে। আর যারা

লাইব্রেরীতে থাকে—দেখেছ তো পাশ বলিশ নিয়ে কি রকম কাড়া-কাড়ী। তবে ব'লতে পার ইউনিভার্সিটিকে কিছু সাহায্য করা হ'চ্চে। গল্প লিখতে ব'সে যে দুটো কাল্পনিক নাম খুঁজে বের ক'রব তার পর্য্যন্ত যো রাখেনি। যেটাই লিখি সেটাই কাউকে না কাউকে বেঁধে। এমনি ধারা কয়েকজন উকিলকে নিয়েই হ'ল কথা।

*　　*　　*　　*　　*

ধ্যানবাবু উকিল। বছর চারেক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। বন্ধুবান্ধব যদি জিজ্ঞাসা করেন—তারপর ভায়া কেমন চ'লচে? উনি উত্তর দেন—Below hundred (বিলো হাণ্ড্রেড)। ইহার অধিক বলিতে গররাজি। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সরিয়া পড়েন।

অতি মাত্রায় জুলুম করিলে বলেন—আব্দার নাকি? ভদ্রতার একটা সীমা থাকা উচিত। রোজগারের কথাটা ভদ্দরলোককে জিজ্ঞেস ক'রতে নেই তাও জান না? নিতান্ত আপনার জন যদি কেহ জানিতে চাহে তাহা হইলে বলেন—Below hundredই বটে। ধর চার বচরে সর্ব্বসাকুল্যে চারটে ওকালতনামা সই ক'রেচি। অবিশ্যি মামাশ্বশুরের। মোট আটটা টাকা পেয়েচি তা হ'লেই গড় ক'রে ফেল। ধর বচর দুটাকা হিসেবে। মামা শ্বশুরের কেস। ভাগ্নে-জামাই থাকতে আর তিনি যাবেন কোথায়? এসব ব্যবসার পসার জমান সময় সাপেক্ষ। ধৈর্য্য হারালেই ব্যস।

*　　*　　*　　*　　*

সরিৎ, হরিৎ, ত্রিদীপ, প্রদীপ, পঞ্চদীপ, আতাউল্লা ও ধ্যান প্রভৃতি উকিল মহোদয়গণকে লইয়া একটি ক্লাব গঠিত হইল। সহরের কেন্দ্রস্থলে একটা ঘরভাড়া লওয়া হইল। কয়েকদিন ধরিয়া ক্লাবে যাতায়াত

চলিতেছে। এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তু বিভিন্ন প্রকার। যেমন— সাহিত্য, কলা, দর্শন, আইন, বিজ্ঞান মাই ডাক্তারি কবিরাজি থেকে থানকুনি পাতা, গুলুঞ্চ মকরধ্বজ, সিঙ্কোনা প্রভৃতি গাছগাছড়ার উপকার অপকার পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কথায় কথায় কথা উঠিল ক্লাবের উদ্বোধন ও নামকরণ প্রয়োজন। আপত্তি ইহাতে কাহারও নাই। কিন্তু উদ্বোধন ও নামকরণ করিবেন কে? ধ্যানবাবুর মুনসেফবাবু অস্ত প্রাণ। তিনি মুনসেফবাবুর নাম জপের সংখ্যায় (অর্থাৎ ১০৮ বার) করিয়া থাকেন। প্রভাতে উঠিয়াই দশবার না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে লক্ষবার পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন। লোকে কাজেই তিনি মুনসেফ ধনেনবাবুর নাম প্রস্তাব করিলেন। অমন লোক আর হয় না। সেকালের এম, এ, বি, এল, সামান্য পনের বছরের মধ্যে কমসে কম একশ জনকে (Supersede) টপকে কাষ্ট মুনসেফ হয়েছেন। শিগ্‌গী নাকি সবজজ হবেন। এই গেজেটেই আশা করা যায়। তারপর ভবিষ্যতি ত বাঁধাই রইল। ওসব লোক হাই-কোর্টের জজ না হয়েই যায় না। কি অমায়িক লোক হে? আমাদের ধনেনবাবুকে দেখ আবার মুখুজ্যে সাহেবকেও দেখ।

হলেই বা মুখুজ্যে সাহেব I. C. S. তাতে কি? মুখপানে তাকিয়ে দেখ যেন তোলো হাঁড়ি। মোটে মিষ্টিকথা বলতে জানে না। ওঁর ঐ কাজেই শেষ বলে রাখছি—না হয় লিখে রাখ; ভবিষ্যতে মিলিয়ে নিও। ধনেনবাবুর ওপরটা ঝুনো হলেও ভেতরটা শাঁসে ভর্ত্তি। একটু রাশ-ভারি বটে কিন্তু সেটা negligible এই ত কালই রোহিতকে যা লাবডান দিল? তার পরেই ত' আবার টিফিন ঘরে ডেকে আমাকে আর রোহিতকে মিষ্টিকথায় বসিয়ে মিষ্টি ফজলি, মোটা রুইমাছ ভাজা

খাইয়ে তবে ছেড়ে দিল। লোকটার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। ভারত-লক্ষ্মী বনাম ইন্দ্রনাথের ওই পার্টিসেন সুটটায় Judgement দিয়েচে হাজার পাতা। গালাগালি দিয়ে বলতে পারি অমন ইংরিজি মাথা খুঁড়লেও তোমার মুখুজ্যে সাহেবের মগজে গজাবে না। ইংরিজির ফোর্স কি ? একেবারে পিয়াসিং। ত্রিদীপ বলিল বোধকরি তোমার মুনসেফবাবুর পালা শেষ হয়েছে। আর বেশী না বললেও আমরা তোমার মুনসেফবাবুর নাম সমর্থন করছি। দয়া করে তুমি একটু ক্ষান্ত হও। হয়ত আরও কেউ কিছু বলতে পারেন। হাটাৎ সরীৎ বলে উঠলো, দেখ ওসব অফিসিয়াল মহল আমাদের মধ্যে এনে কাজটা কি ভাল হবে ? ধ্যানবাবু বললেন, ঘনেনবাবু এখানে ত' মুনসেফের Capacityতে আসছেন না। তিনি আসছেন As Mr ঘনেনবাবু। ভায়া ওই কথাটা শুনলে সত্যিই হাসি পায়। ম্যাজিষ্ট্রেট বক্তৃতা দিতে উঠে যখন বলেন—I am speaking not as a Magistrate but as Mr. Morrison তখন রাগে ব্রহ্মাণ্ড বিষিয়ে যায়। গা রি রি করে ওঠে। ওটা তোমাদের বোঝার ভুল। প্রধান মন্ত্রী হাজার বলুন না কেন I am not speaking in the capacity of a chief minister সে কথাটা বিশ্বাস হয় না। তার মানে তিনি বরঞ্চ আর একবার পরক্ষভাবে জানিয়ে দিতে চান আমি প্রধান মন্ত্রী তোমরা হুঁসিয়ার। বেশী চালাকি ক'রো না। যতই বল ভাই লাটের লাটত্ব, মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব জজের জজত্ব, মুনসেফের মুনসেফত্ব, ধুতিচাদরেও যা কোটপ্যাণ্টেও তাই ওঁদের আমরা মিষ্টারের capacityতে দেখতে পারি নে। ওঁরা যা সব সময়েই তাই। সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল। পর দিবস ঘনেনবাবু আসিয়া একটি লাল ফিতা কাটিয়া ক্লাবঘরের উদ্বোধন

করিলেন এবং ক্লাবের নামকরণ করিলেন "শনিবাসর"। অতঃপর জলযোগ তৎপর বিদায়।

* * * * *

আজ শনিবাসরে আতাউল্লা সাহেব গীত পাঠ ও কীর্ত্তন করিবেন। এদিকে ধ্যানবাবু তাঁহার কবিতা পাঠ করিবেন কথা আছে সেই সঙ্গে তাঁহার একখানি বালবোধও শুনাইয়া দিবেন। ধ্যানবাবু গোল আলুর মত। খোলে অম্বলে সকল তাতেই আছেন। কেহ ঠাট্টা করিলেও গায়ে মাখেন না। কেবল মুখে একটি যুক্তিহীনভাব ফুটিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে এমন একটা অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের ভাব টানিয়া আনেন তাহাতে তিনি বলিতে চান—ওগো তোমাদের ঠাট্টার পেছনে কোন যুক্তি নেই আমি যা বলি তার ওপর আর কথা নেই। তোমাদের সঙ্গে আমি ভূয়ো তর্ক ক'রতে চাইনে। আছে আছে—আমার প্রতিবাদ করার মত ঢের কিছু আছে। কিন্তু আমি তা ক'রতে চাইনে। যুক্তি অবশ্য ধ্যানবাবুর কিছুই নাই শুধু ঐ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার ভাবই হইল তাঁহার একমাত্র যুক্তি। এক কথায় বলিতে গেলে এ যেন দুর্ব্বল ক্ষমা। সবলের হাতে চড় খাইয়া বোকার মত অক্ষমতার পরিচয় না দিয়া বুদ্ধিমানের মত আর একগাল যীশুখৃষ্টের উপদেশ অনুযায়ী পাতিয়া দিয়া বলা—নাও আর এক ঘা লাগাও। পরে বন্ধু মহলে বলা—ক্ষমা ক'রলাম। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করিনে।

আর একদিকে আতাউল্লা সাহেবের মুখখানি কবিত্বে ভরপুর। তিনি এমন ভাব দেখান তাহাতে মনে হয়—দেশে যদি কবি থাকে ত আমিই আছি। তোমাদের ওগুলো কবিতা নয়। ওগুলো হ'ল গবিতা। চাকরীত' আতাউল্লা সাহেবের জুটিয়াছিল। কিন্তু ছোটখাট

চাকরী তাঁহার জন্য নয়। এখনই নয় দিনকাল খারাপ পড়িয়াছে তাই তেমন পসার জমে নাই। কিন্তু চিরদিন ত' এক রকমই যায় না। মিউনিসিপ্যালিটি বা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে মেম্বর অথবা চেয়ারম্যান ভাইস-চেয়ারম্যান কোন গতিকে লাগাইতে পারিলে ভবিষ্যতে কাউন্সিলে মেম্বর হওয়াটা বেশী কিছু শক্ত হইবে না। তাহার পর দশ এগারজন মন্ত্রীর মধ্যে এ-কজন। সে আর বেশী কথা কি?

* * * * *

আতাউল্লা সাহেব গীতা পাঠ সুরু করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে কেহ কেহ শুনিতেছে আর মাঝে মাঝে ঝিঁকি মারিয়া উঠিতেছে এবং মুখে বলিতেছে—আহা! ও'দিকে ধ্যানবাবু একখানা পোষ্ট আফিসের লেজার ফোলিও বিশেষ বিরাট খাতা মুনসেফ বাবুকে দেখাইয়া বলিতেছেন—দেখুন স্যার আমার কবিতা। সমস্তগুলোই ছাপা হ'য়েচে "জগবন্ধু" পত্রিকায়। এই যে দেখ্‌চেন এই হ'লুদে বিয়ের কবিতা এখানা Bar Libraryতে ব'সে পাঁচ মিনিটে লেখা। মুনসেফ বাবু ধ্যানবাবুর সাহিত্য প্রতিভার ভূয়সী তারিফ করিয়া বলিলেন—বল কি ধ্যান? পাঁচ মিনিটে মানবের হাত দিয়ে এ রকম কবিতা বেরোতে পারে তা জানতাম না। অর্থাৎ মুনসেফ বাবুর সংশয় রহিয়া গেল ধ্যানবাবু মানব কি দানব। পরে বলিলেন—সময় বেশী পেলে ত তুমি তাজমহল বানিয়ে ছাড়তে।

তাজমহল ব'ল্লাম কেন জান? আজকাল কবিদের ঐটের ওপর যত ঝোঁক। থাকে থাকে তাজমহল নিয়ে তারা মেতে ওঠে। দেখ তোমার রবি ঠাকুর। তারপর তোমার দত্ত মশাই ঐ তোমার সত্যেন দত্ত প্রবাদ তিনি বেঁচে থাক্‌লে নাকি রবি ঠাকুরকে ছাপিয়ে যেতেন।

তাজমহল লিখতে গিয়ে দুনিয়ার পাথরগুলোর নাম কবিতায় সেট ক'রে ছেড়েচেন। ক'রবেনই। তাজমহলে যে পাথর সেট করা। আবার দেখ এক রেকর্ড বেরিয়েচে বাজারে। মেয়েগুলো তো জ্বালিয়ে খেলে। বলে—বাবা সেই তাজমহলের গানখানা আনবে না? কে লিখেচে কে গেয়েচে তা অবশ্য জানিনে। তাছাড়া আরও কত নীরব কবি তাজমহল নিয়ে কি ক'রচেন না করচেন কিছু ত' জানতে পারচিনে। ধ্যানবাবু মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন—আর কুড়ি বছর পরে এর একটা দাম হবে। অবশ্য তখন আমি দেখতে আসব না।

—বল কি? কুড়ি বছর ছেড়ে তুমি এখন চল্লিশ বছর নিশ্চিন্দি থাকতে পার।

*   *   *   *   *

অপরদিকে ত্রিদীপ ও পঙ্কদীপ বাজি ধরিয়াছে। কে জিতিবে? মোহনবাগান না মহামেডান স্পোর্টিং? পঙ্কদীপ বলিল—যদি মোহনবাগান জেতে তাহ'লে কিন্তু পেটপুরে সরপুরিয়া খাওয়াতে হবে। ত্রিদীপ বলিল—ভারি ত একটা পেটে খাবি। খাস—যত পারিস খাস। পেটটা বইত মোটটা নয়।—তায়া ঐটুকুই ত' বোঝার ভুল। পেট যদি মোট হ'ত তাহ'লে ত' বাঁচতাম। যে কোন প্রকারে একবার ভর্ত্তি ক'রতে পারলেই কাজ শেষ হ'ত। আর এ খোল যে বাগ্ মানতে চায় না। খোলত নয় রাম খোল।

গীতা পাঠ শেষ হইল; ধ্যানবাবুর মালকোষ সুরু হইল। ওদিকে সরিতে ও হারিতে বৈজ্ঞানিক তর্ক বাধিয়াছে। সরিৎ বিশ্বাসী ও ধর্ম্মভীরু। বলিল—জাখ সেকালে আমাদের সবই ছিল। এরোপ্লেন, টেলিফোন, বোমা সেকালে কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু জার্ম্মাণী

সব মেরে নিয়েচে। হরিৎ বলিল—যা বলেচ—ও জাতটাই ঐ রকম। ঐ দেখনা কেন স্যার জগদীশ বের ক'রলেন Radio মেরে দিল ইটালীর মার্কনি। মাষ্টার মশাইরা ত' ছেলেদের রেডিওর আবিষ্কারক হিসেবে স্যার জগদীশের নামই শেখাচ্ছে। আর ছেলেরাও তাই জানে। মার্কনিকে চেনে কজন? এত বস্তু থাকতে জগদীশ বাবু শুধু গাছের প্রাণটাই আবিষ্কার ক'রে গেলেন? আচ্ছা রেডিওর আবিষ্কারক হিসেবে তোমার কি মনে হয়।

ত্রিদীপ বলিল—জগদীশ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ হয় নাকি তোমার?

—হ্যাঁ মানে কেমন যেন একটু—ত্রিদীপ—আরে ভায়া এঁটো কুড়ের পাত কি স্বর্গে যায়? তিনি ত' আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। আমাদের ঐ গাছগাছড়াই যথেষ্ট। রেডিও নিয়ে কি হবে। সরিৎ বলিল—ভাল ভাল সংস্কৃত গ্রন্থ আমাদের ছিলত। জার্ম্মাণী মেরে নিয়েছে। নইলে আমাদের ছিলত' সবই। একখানাও থুয়ে গিয়েচে! ছিল হে ছিল সবই আমাদের এই আর্য্য ঋষির দেশে ছিল।

ত্রিদীপ বলিল—হ্যাঁ ছিল সবই। কিন্তু দুঃখের কথা এখন নেই কিছুই। উত্তরাধিকারীসূত্রে পেলাম কেবল ঢেঁকি, কুলো, পালি, কাঠা আর বলদের মত বুদ্ধি। আর কিছুই না। সরিৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল কি এত বড় আস্পদ্দার কথা? বলদের মত বুদ্ধি আমাদের? ত্রিদীপ বলিল—আধ পয়সার হাঁড়ির মত দা চ'টে একটু অবসর ক'রে ভেবে দেখো কিছু ভুল বলিনি। দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন মহেনজোদারো আবিষ্কার হ'য়ে গেল কিন্তু তোমার পুষ্পরথ বা বোমার কারখানা এখনও পর্য্যন্ত একটা বেরুল না।

ওদিকে ধ্যানবাবুর মালকোষ নিবন্ধন কণ্ঠক্রীড়া অশ্রান্ত ভাবে

চলিয়াছে। গলা খেলানর সুযোগ একবার করায়ত্ত হইলে তিনি সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কি মুখভঙ্গিমা! মুখব্যাদনের একটা সীমা আছে এ যেন মনে হইতেছে তিনি মুখের সাহায্যে জ্যামিতির বৃত্ত বা কোন অঙ্কন করিতেছেন। ইচ্ছা হয় কম্পাস দ্বারা মুখের ডায়েমেটারখানা মেপে নিই। চোখেরই বা কি অপরূপভাব। মনে হয় যেন প্রাণপক্ষী চক্ষুদ্বারা বহির্গত হইবে। খুংনি বাঁকানরই বা বাহার কি? জিভখানা শুদ্ধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওস্তাদি কচ্চে। বাড়ী-ওয়ালা বৃদ্ধ মালকোষের চোটে অস্থির হইয়া যষ্ঠী হস্তে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—এটা ভদ্দরলোকের বাড়ী। দুটো গরু বাছুর নিয়ে বাস করি। দেখত তোমার মালকোষে গরুতে দড়া ছিড়ে কি কাণ্ড ক'রেচে। ভাড়ার সঙ্গে খোঁজ নেই—ভারি তোমার মালকোষ। বেরিয়ে যাও বলচি। শীঘ্রি বেরিয়ে যাও। ক্রমে বৃদ্ধ লাঠি উচাইয়া ধ্যানবাবুর দিকে অগ্রসর হইলেন। ধ্যানবাবু হারমোনিয়ম ছাড়িয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলে পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। বৃদ্ধ ডাকিলেন—গোপেশ্বর—তালা চাবি নিয়ে আয়—আর হারমোনিয়মটা নিয়ে যা। হারমোনিয়ম বেচে ঘর ভাড়া শোধ ক'রে নেব।

যন্ত্র-জীবনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস

অনিলকুমার চক্রবর্তী

বেলা ন'টার ডাকে একখান রঙিন চিঠি এসে হাজির। কোথা হতে আসা সম্ভব ? ম্যাকে খামের চিঠি, তার ওপর রঙিন। কৌতুহলি মনে কবির একটা লাইন জেগে উঠে —

"প্রথম প্রণয় পিরিতির লেখা—রঙিন পাতে।"……

বেশী না ভেবেই খুলে ফেলি পত্রখানা। চম্‌কে যাই— অনেকদিনের পুরাতন স্মৃতির মরচেপড়া বন্ধ দরজাটা ক্যাঁচ কোঁচ করে ফাঁক হয়ে যায়। আবোল তাবোল চিন্তার মধ্যে পত্রখানি পড়ে ফেলি—

প্রিয় রণুদা,

আমরা আজ ছ'দিন হলো এখানে এসেছি। আজই আবার যাবার দিন। ওঁর মাত্র ১২ দিনের ছুটি তাও ফুরিয়ে এলো। অনেকদিন দেখিনি। যদি কাল বেলা চারটে পাঁচটার মধ্যে আসেন তো দেখা হয়।

স্নেহের—'লিলি' (নবদ্বীপ)

সে আজ তিন বছরের কথা। তখন কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। আমাদের সঙ্গে সহপাঠিনী ছিল কয়েকটি মেয়ে—লিলি তাদেরই একজন, লিলির পিতা ছিলেন এখানকার একজন বড়

অফিসার বাসা ছিল আমাদেরই বাড়ীর পাশে। এক সাথে পড়ি, বাসা পাশাপাশি, কাজেই লিলির সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়টা জমে উঠতে দেরী হয়নি। এবং সে পরিচয়টা যে ক্রমেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—তা অনুমান করাটা ক্লাসের অন্যান্য বন্ধুদেরও শক্ত হয় নি। এ নিয়ে অনেক টিকাটিপ্পনী সইতে হয়েছিল।

লিলি কাজে অকাজে আমাদের বাড়ী আসতো। মা, বউদির সঙ্গে গল্প করতো—কখন বা চায়ের কেটলি কেড়ে নিয়ে 'রণুদার' জন্যে চাও তৈরী করে ফেলতো; আমার সঙ্গে বায়োস্কোপে যাওয়া তার একটা নেশা ছিল। আমারও ছিল তাদের বাড়ীতে অবারিত গতি। এর ফলে যদি আমরা দুজনে দুজনকে ভালই-বেসে ফেলি, তা কি এমনই অন্যায়!

মনে মনে রঙিন স্বপ্ন গড়ে তুলছিলাম হয় তো। কিন্তু এমন সময়...

চা বাগানের ম্যানেজার। আসাম টি এষ্টেটের ম্যানেজার। খুব বড় লোক। অনেক টাকার মালিক। নবদ্বীপের আদি বাসেন্দা। নবদ্বীপে খান ছয়েক বড় বড় বাড়ী জানিয়ে দিচ্ছে ইনি বড় লোক। এ হেন গোবর্দ্ধনবাবুর সঙ্গে লিলির হয়ে যায় বিয়ে।

একদিন শুভলগ্নে লিলি সুদূর আসামে চলে যায়, এক অপরিচিতকে পরম আত্মীয় করে নিয়ে। আমার অন্তরটা খাঁ খাঁ

করে যে উঠে, একথা না বললেও চলে। বহুদিন তাকে ভুলতে পারিনে। তবু দীর্ঘ তিন বৎসরের অতীত ধীরে ধীরে স্মৃতির ক্ষতের উপর বিস্মৃতির প্রলেপ দেয়। এই সুদীর্ঘকালে লিলির কোন চিঠি পাই নি—কোন সংবাদ পাই নি! ইচ্ছে করে আমিও নিতে চেষ্টা করি নি! ভেবেছি সেও আমায় ভুলে গেছে। আর সে কথা ভাববার কারণও যথেষ্ট।

লিলির বিবাহের পরদিন যখন তারা 'বর-ক'নে' চলে যাবে, আমি অনেক চেষ্টা কোরে, অনেক ফন্দি কোরে, তার সঙ্গে একবার দেখা করি। সেদিন তারা সন্ধ্যার ট্রেনে যাত্রা করবে নবদ্বীপ। কাজেই সারাদিন ছিল অবসর। বিবাহ বাটীর নানা সোরগোলের মধ্যে তাদেরই বাড়ীর শিঁড়িঘরের এক কোনে অনেক কষ্টে দেখা করি লিলির সঙ্গে। নব বধূ বেশে লিলি। চমৎকার মানিয়েছে। তাকে বসতে বলি—সে যেন একটু সঙ্ক, চিত্তা হয়ে পাদুটি গুটিয়ে নিয়ে বসে পড়ে। আমিও বসে পড়ি। কি যে বলি ভেবে পাই নে। আমার অন্তর তখন হু হু করে জ্বলে। কেবল মাত্র বলি—লিলি।

সে চোখের উপর চোখ রেখেই বলে—'রণুদা!'

পাঁচ মিনিট আমরা কথা কই নি!

তারপর আমিই উদাস হয়ে বলে ফেলি।—লিলি, 'ভুলে যাও!' সে তখনি মাথাটার ঘোমটা টেনে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—হাঁ, জন্মের মত! আমি এখন পরস্ত্রী!

আমি এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে সেখান হতে পালিয়ে আসি—। তারপর লিলির কথা ভুলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ হঠাৎ রঙিন খাম আমার মনে রং লাগিয়ে দেয়। সঙ্কল্প এক মুহূর্ত্তেই স্থির হয়ে যায়—দেখা কাল করতেই হবে।

কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের কাছে বাস ষ্ট্যাণ্ডে একখানি মাত্র বাস মোটর। বাসের কাছে এসে পত্রখানি খুলে দেখি ''পাঁচটার মধ্যে''—ঘাড়টার দিকে চাই—সাড়ে এগারটা।

ড্রাইভার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি—কখন ছাড়বে?

—এই ছাড়ে আর কি! চারজন হলেই ছাড়বে!

মনে মনে হিসাব করে দেখি—আমায় ছাড়া আর তিনজন।

অনেকক্ষণ বসে আছি। একটা অজানা আনন্দে মনটা অন্যমনস্ক আকাশ পাতাল—আবোল তাবোল কত-কীই ভাবি। অনেক স্মৃতি আজ কুটলা পাকায় মনে। হঠাৎ এক সময়ে ঘড়ি দেখি আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। চেয়ে দেখি—একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসেই বলে—মশায়, এ বাসটা কি নবদ্বীপ যাবে?

—আজ্ঞে যাবে মশায়, উঠে আসুন। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিই। গরজ আমার।

ভদ্রলোক উঠে এসে বলেন—''বাবা, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে বাবা? আমরা আরও তিনজন আছি। হোটেলে দুটো খেয়েই আমরা আসছি। তার পরেই তুমি বাসখানা ছেড়ো বাবা।

ড্রাইভার সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নেড়ে বলে তাড়াতাড়ি

আসবেন। ভদ্রলোক নিশ্চিন্তমনে চলে যান। আমি মনে মনে ঘড়ির বড় কাঁটার সঙ্গে আধঘণ্টা জুড়ে দিয়ে ভেবে নিই বাস ছাড়তে ১২॥ টা! মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেও চুপ ক'রে বসে লিলির কথাই ভাবতে থাকি! ক্রমে আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়! দেখতে দেখতে পঁয়ত্রিশ মিনিট, পঞ্চাশ মিনিট, তার পর এক ঘণ্টা; ভদ্রলোকর হোটেলে খাওয়া কি এখনো হয় নি!

নিরুপায় হয়ে—জিজ্ঞাসা করি কি হে, ছাড়বে কখন? ঠিক এমনি সময় সারদাবাবুর বাড়ীর একটা লোক এসে জানায় দু' জন মেয়ে আছে, আপনারা যদি তাড়াতাড়ি মোটর ছাড়েন তা'হলে তাদের তুলে নিয়ে যান।

ড্রাইভার উত্তর দেয় বেশ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে—এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে তাঁদের তুলে নেব। তৈরী হয়ে থাকতে বলুন! কি সর্ব্বনাশ! আবার আধ ঘণ্টা।

হোটেলে-যাওয়া-ভদ্রলোক একা একটি পুটুলি নিয়ে যখন ফিরে আসেন, তখন বেলা দুটো। এখনো যদি বাস ছাড়ে তা হলেও নবদ্বীপে পাঁচটার পূর্ব্বে পৌঁছানো যায়। কিন্তু ড্রাইভারের তো তেমন কিছু ইচ্ছা নেই। একটু বিরক্তির সুরেই বলি—আমার জরুরী দরকার, তুমি মটর ছাড়বে কি না, তাই বলো। নইলে নেমে যাই। ড্রাইভার এবার আমার দিকে চেয়ে বলে—"আচ্ছা, তবে আর দেরী করবো না। সরদাবাবুর বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে এক্ষুনি ছাড়ছি।"

বাস বিরাট শব্দ করে জজ কোর্টের মাঠে "নবদ্বীপ" "নবদ্বীপ" বলে গোটাকয়েক হাঁক দিয়ে নবদ্বীপের উল্টোপথে সারদাবাবুর বাড়ীর দিকে ছোটে ;

এতক্ষণ নিশ্চলতার পর গতির আনন্দে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাল ক'রে চেপে বসি।

সারদাবাবুর বাড়ীর দুটি মেয়ে আমার ঠিক সামনের বেঞ্চে বসে পড়ে। পুনরায় বাস জজ কোর্টের দিকে চলতে সুরু করে। এমন সময় পূর্ব্বের ভদ্রলোক যিনি আমার পাশেই বসে ছিলেন— তিনি চেঁচিয়ে উঠে বলেন—"থামো থামো আমার সঙ্গীদের তুলে নাও।"

বাসটা ঘোড়-দৌড়ের রাসটানা ঘোড়ার মত হঠাৎ থেমে পড়ে। ভদ্রলোক লাফিয়ে নেমে পড়েন।

— আরে নন্দ, সমীর, নির্ম্মল সিগ্‌গির এস - সিগ্‌গির এস।

তারা বাসের কাছে এসেই ড্রাইভারকে বলে - একটু অপেক্ষা করুন— আমাদের একজন উকিলবাবুর সঙ্গে কথা কচ্ছেন ; এলেন বলে।

ড্রাইভার গাড়ীর ষ্টার্ট থামিয়ে ফেলে বলে—"তাড়াতাড়ি করুন," আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে বলে ফেলি— তিনটে বাজে। আর কখন গিয়ে দেখা হবে। আর না যাওয়াই ভাল ? হঠাৎ সামনের মেয়েটি বলে—য়্যাঁ, তিনটে বাজে ? আবার দেখুন তো ঘড়িটা।

—হাঁ। তিনটা বাজতে মিনিট ১২ বাকী।

—আমাদের যে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছুতে হবে নবদ্বীপ। তবে আর আজ যাওয়া হয় না। চল অর্পণা বাড়ী ফিরে যাই।

—নবদ্বীপে কোথায় যেতেন ?

—গোবর্দ্ধনবাবুর বাড়ী।

—য্যাঁ! গোবর্দ্ধন! লিলি ? অজ্ঞাতেই বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।

—হাঁ, উনি আমার বউদি হন। আপনি চেনেন দেখছি। ভট্ ভট্ শব্দে বাস স্টার্ট নেয়।

তাঁরা উঠতে যাবেন। আমি বাধা দিয়ে বলি—আমরা নামি আগে, তারপর উঠবেন।

ভদ্রলোক চোখ পাকিয়ে বলেন—আপনারা তিনজনেই নামবেন ? মেয়েটি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে—নামাই ভাল। এখন গেলে ৫ টার আগে সেখানে জমা একান্তই অসম্ভব।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠেন। বলেন—আপনারা নামলে গাড়ী লোকাভাবে ছাড়তে আরও দেরী করবে।

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলি—তাতে আমাদের কি; আমিও বসে আছি চার ঘণ্টা—আপনারাও না হয় বসে থাকবেন সারা রাত।

ভদ্রলোক শিউরে উঠে বলেন—সারারাত! কাল সকালে ছাড়বে ? সে কথার জবাব না দিয়ে আমরা বাস হতে তিনজনেই নেমে পড়ি।

অনিলকুমার চক্রবর্তী

লিলির চিঠি পেয়েও যে দেখা করা হলো না এই দুঃখই আমার মনে বারে বারে উঁকি দেয়। অন্যমনস্ক হয়ে আমরা রাস্তায় দুই এক পা বাড়িয়েছি—

হঠাৎ পিছনে একখানি মোটর হর্ণ দিয়ে একেবারে থেমে যায়, পিঠের কাছে বিরাট শব্দ হয়—ঘ্যাস্‌স্‌।

আমরা চাপা পড়তে পড়তে ভগবানের কৃপায় বেঁচে যাই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অপর্ণা চেঁচিয়ে উঠে—য়্যাঁ, বউদি! তুমি! আরে গোবর্দ্ধন দাদা যে। অপর্ণা! সুরমা! কি সর্ব্বনাশ ভাগিা চাপা পড়নি! লিলি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নেমে আসে—

য়্যাঁ একি? রণুদা! তুমিও!

গোবর্দ্ধনবাবু হেসে ভেতর হতেই বল্লেন—ভগবানকে ধন্যবাদ! সবাই উঠে এস! রণুবাবু আসুন, আপনার দেরী দেখে আমরা আপনার ওখানেই চলেছি!

গাড়ী ষ্টার্ট নেয় একরাষ্ট পাইপের ধূমা ছেড়ে—যেন যন্ত্র-জীবনের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস।
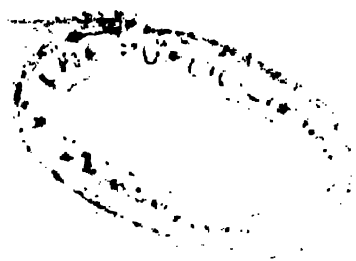
ডায়েরীর এক পাতা

মোল্লা মহাম্মদ আব্দুল হালিম্

২২শে বৈশাখ, ১৩৪৭। সার্কেল অফিসার মহোদয়ের বিদায় উপলক্ষে কোম্পানীর বাগানে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রতিষ্ঠিত জাহাঙ্গীরপুর ফার্মের সন্নিকটে ছায়াঘন এক কুঞ্জবনে ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে ; রসদ জুগিয়েছেন সার্কেল অফিসার মহোদয়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়গণ। বহু গণ্যমান্য লোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন ; অক্লান্তকর্মী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা বুট পরে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের মাহাত্ম্য তাঁর স্বলিখিত ইংরাজী বই প'ড়ে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিমন্ত্রণ হয়েছিল মধ্যাহ্ন আহারের কিন্তু অপরাহ্নের আগে পাত পড়েনি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভারি খুসী, সকলের জাত মেরে দিয়েছেন বলে।

শচীন বাবু পণ্ডিত অধ্যুষিত বেলপুকুরবাসী, খুব চালাক লোক, সাত্বিক ব্রাহ্মণ। ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন সারাদিন অভুক্ত থেকে। তাঁর সঙ্গে বাসায় ফিরলাম বৈকালে।

বেলপুকুর স্কুল কমিটির খুব জরুরি মিটিং বিকালে. কলকাতা থেকে নিত্যবাবু আসছেন, কৃষ্ণনগর থেকে ভোলানাথ বাবু. শচীন বাবু ও আমার যাবার কথা। কপালে দুঃখ আছে তাই আর এক বামুণ জুটলেন হাবুলচন্দ্র। ট্রেণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সাইকেল ছাড়া উপায় নাই। ভয় হলো ভোলানাথ বাবুকে নিয়ে—বয়স ভাটার দিকে, কিছুদিন পূর্বে ডাকাতের পাল্লায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে—বাড়ীতে নাকি আবার

দুর্যোগের আসন্ন সম্ভাবনা। যাহোক অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাত্রেই কৃষ্ণনগর ফিরতে পারবেন আশ্বাস দিয়ে তাঁকেও সঙ্গী করা গেল।

বৈশাখের বিকালে আসন্ন কালবৈশাখীর আভাস ছিল। পুরাতন ভৃত্য খোসবাসের কাছে অভয় পেলাম দুর্যোগ ঘটবে না, মেঘ কেটে যাবে। খোসবাস চাষী, তাদের প্রকৃতির খামখেয়ালীর উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয় ব'লে, তারা আবহাওয়া সম্বন্ধে সহরের সাধারণ বাবুদের চেয়ে অনেকখানি বিশেষজ্ঞ। আকাশের অবস্থা দেখে ঝড় মেঘ সম্বন্ধে মোটামুটি যা বলে তা প্রায়ই ঠিক হয় এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

যাহোক তিনটি সুব্রাহ্মণ সঙ্গে করে সাইকেলে বেরিয়ে পড়লাম। ঘাটে এসে দেখি মেঘটা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে আসছে। মাঝি বললে "বাবু, যাবেন না, ঝড় উঠ্‌ছে" আমরা সে কথায় কাণ দিলাম না। ভাবলাম এইটুকু ত রাস্তা চোঁ করে চলে যাবো। কপালে দুঃখ আছে তা খণ্ডাবে কে? বাহাদুরপুর লেভেল ক্রসিং থেকে যখন খানিকটা দূর, দু এক ফোটা জল গায়ে পড়লো—সেগুলো যে এক বিরাট ঝড় বৃষ্টির অগ্রদূত তা তখন বুঝতে পারিনি। বর্ষাতি গায়ে পরবার জন্য নামলাম, হাবুলবাবুও নামলেন; ভোলাবাবু ও শচীনবাবু গুমটি ঘরে আশ্রয় নিয়ে আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান হবার আশায় প্রচণ্ড ঝটিকার বিরুদ্ধে সাইকেল চালালেন।

সাইকেল থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ ঝড় উঠলো—ঝড়ের বেগে চতুর্দ্দিক ধূলায় অন্ধকার—ছোট ছোট ইট পাটকেল চটাপট গায়ে এসে আঘাত করছে—কিছুই দেখবার উপায় নেই, চোখ বন্ধ করে পরবর্ত্তী বিপদের পরিণতি অনুভব করছি। নিকটে একটা

বেলগাছের তলে আশ্রয় নেবো আশা করে যাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সাইকেল শুদ্ধ আমাকে উড়িয়ে নেবার উপক্রম হ'লো। সাইকেলটা ছেড়ে দিলাম—সেটা ঝড়ে ছিটকে কিছুদূরে গিয়ে পড়লো—তখন বসে বসে কোন প্রকারে মাটি ধরে গাছতলায় এলাম; হাবুলবাবু আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন দেখলাম। ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় গাছগুলো ওলোট পালোট খাচ্ছে, মাথার উপর ভীষণ বারিধারা মুহুর্মুহু মেঘের গর্জ্জন। আমাদের মধ্যে প্রাণ যে তখনও আছে সেই এক আশ্চর্য্য।

ভোলানাথ বাবু ও শচীন বাবুর গুমটি ঘরে নিরাপদ আশ্রয়ের কথা ভাবছি এমন সময় দেখি ভোলানাথ বাবু আমাদের দিকেই আসছেন—সম্পূর্ণ দিগম্বর, ধুতির একপ্রান্ত কোনরকমে একহাতে ধরে আছেন; বাকি অংশটা পথের কাদায় লুটুচ্ছে। দেহ যেখানে বিপদাপন্ন সেখানে দেহাবরণের অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাঁকে কাপড় পরিয়ে দিলাম। সেই সঙ্গে তাঁর 'মাথা গেল, মাথা গেল' কাতরোক্তি শুনে ভীত হলাম—শেষকালে কি ব্রাহ্মণ হত্যার পাপে পড়বো নাকি? মাথায় বৃষ্টির ধারার সঙ্গে রুমাল নেড়ে বাতাস করায় শীঘ্রই তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'লেন। পরে দেখি শচীনবাবুও গাছতলায় আশ্রয়প্রার্থী। বুঝলাম গুমটি পর্য্যন্ত আর পৌঁছুতে পারেন নি।

আমরা ৪টি নিঃসহায় প্রাণী জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে গাছতলায় বসে আছি। কালবৈশাখী তার উদ্দামনৃত্য অবাধে চালিয়েছে এপাশে ওপাশে ডাল ভেঙ্গে পড়ছে—অদূরে টেলিগ্রাফ পোষ্ট দু একটা ভেঙ্গে তার ছিঁড়ে পড়ে গেলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঝড় বৃষ্টি থামলে বাহাদুরপুর ষ্টেশনে গিয়ে ভিজা

জামাগুলো পোঁটলা বেঁধে নিলাম। তারপর কথা উঠলো কোথায় যাওয়া যায়—নিজ নিজ বাড়ীতে না গন্তব্যস্থানে। শেষ পর্য্যন্ত সাব্যস্ত হ'লো বেলপুকুরেই যেতে হবে এবং সিটিং করতে হবে। তথাস্তু; ভিজা কাপড়ের পোঁটলা সাইকেলে ঝুলিয়ে সিক্ত বসনে আবার যাত্রা সুরু হ'লো। সদ্য বৃষ্টিতে ভেজা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যেতে ৩।৪ বার আছাড় খেয়ে কাপড় ছিঁড়ে যখন বেলপুকুর পৌছুলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

সিটিং হবার কথা ছিল বৈকালে, শুনলাম যথাসময় সকলে স্কুলগৃহে সমবেত হয়েছিলেন কিন্তু সিটিং হয়নি। আমরা মরণাপন্ন অবস্থায় শচীন বাবুর বাড়ীতে উঠেছি শুনে সকলে ব্যক্তিগত দলাদলি ভুলে সেখানেই জুটলেন। রাত্রি ৮টায় মিটিং বসলো, আলোচ্য বিষয় স্থানীয় স্কুলের উন্নতি সাধন। যেন কোন্ এক যাদুস্পর্শে শতধাবিভক্ত বেলপুকুর আজ একমতে স্কুলের মঙ্গলসাধনে উন্মুখ হয়ে উঠলো। গ্রাম্য দলাদলির অবসানে সেই রাত্রের সভাতেই জনসাধারণ দানে মুক্তহস্ত হয়ে সহস্রাধীক টাকা চাঁদা তুলে ফেললেন। স্থানীয় স্কুলটি সজীব হয়ে উঠার মূলে কি ছিল—আমাদের কালবৈশাখীর প্রলয় নৃত্য ?—সিটিং শেষ হলো রাত্রি ১০টায়। সাইকেল অচল, গোযানে সাইকেল বেঁধে নিয়ে বামুনপুকুর এলাম দুপুর রাতে। বিশিষ্ট বন্ধু-পুত্রের প্রীতি-ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল—কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণপূর্বে খাওয়া-দাওয়া সর্ব্ব শেষ হয়েছে। বুঝলাম তিনটি সুব্রাহ্মণের যোগ কি ভয়াবহ—একেবারে ত্র্যহস্পর্শ।
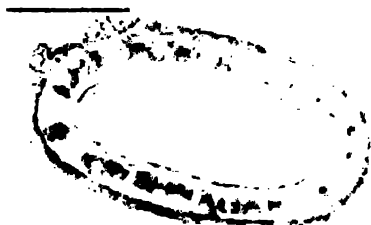
কেনারাম ভট্টাচার্য্যের পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, বৌটার হাড় জুড়ালো। আহা! সময় মত কোনদিন খেতেও পায়নি মেয়েটা! বেলা তিনটে চারটে—কোনদিন বা সারাদিন হা পিত্তেশ ক'রে ব'সে আছে—কখন পরম-দেবতা আসবেন!

কেনারাম হয়ত সন্ধ্যেবেলায় ফিরলেন, দু'চোখ লাল—হাতে আস্ত একটা পাটার অর্দ্ধেক। রাঁধ্ তখন মাংস! সতী-সাধ্বীর হাড় জুড়ালো।

কেহ বলিতেছে, বুঝুক নিজে এখন ঠ্যালাটা! দাঁত থাকতে কি কেউ দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে?

কেহ বলিতেছে, 'গোল্লায় যাবে এবার। কোথায় কখন প'ড়ে থাকবে ঠিক কি? কে ওর হ্যাপা সামলাবে!

বিন্দুবাসিনী দুঃখ করিয়া বলিলেন, যাই বল বৌ, নেচে নেচে কি

আরতিটাই মা করত কেনারাম! পূজোয় ব'সলে মা যেন ওর ঘাড়ে ভর করতেন!

শিব সীমন্তিনী সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। মায়ের নামে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, করবে না? বংশটা দেখতে হবে ত? সর্ব্ববিদ্যাবংশ,—মা বেচে এসে ওঁদের পূজো নেন্। সেবার কেশব মুখুয্যের বাড়ী কেনারাম নৃত্য ক'রছে আর ফুল দিচ্ছে মায়ের পায়ে। কেশব এসে ব'ল্লে' ঠাকুর মশাই, মন্তরগুলো একবার ঐ সঙ্গে— কেনারাম লাফিয়ে উঠে ব'ল্লে, উচ্চারণ করতে হবে? কার হাতে মায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে জানো কেশব? তারপর—শিব সীমন্তিনী ঠাকুরাণী আর একবার দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া চক্ষু বুজিয়া বলিলেন, তারপর সে কথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়! মায়ের খাঁড়া নিয়ে দিল মায়ের বুকে বসিয়ে কেনারাম। ফিনকি দিয়ে মায়ের রক্ত বেরিয়ে এল! তারপর কেশবের গুষ্টিপোষায় কেনারামের পায়ের উপর! সেইবার হ'ল জোড়া পূজো। ও সব শক্তি-সাধক, শাপভ্রষ্ট লোক, ওদের সঙ্গে কারও তুলনা হয়? বৌটা ত' গেল, এইবার কেমন ও ঘরে থাকে দেখে নিস্!

প্রতিবেশী বলিয়া কেনারামকে আমরা চিনিতাম। তাহার বয়স পঞ্চাশ। মেয়েদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কেনারামের ছন্নছাড়া গৃহস্থালী; কিন্তু গৃহস্থালীকে সে কেয়ার করে না। সর্ব্ববিদ্যা বংশোদ্ভব কেনারাম ভট্টাচার্য্য লালকাপড় পরিয়া ও রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়া বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—একি তোমার কেহু চক্কোত্তি, যে সংযম, পারণ, উপবাস করলে তবে মায়ের পায়ে ফুল দিতে পারবে? কেনারাম গ্রীবা উত্তোলন করিয়া বলে, সর্ব্ববিদ্যা বংশোদ্ভব কেনারাম,

পেটপুরে খেয়ে, একপাত্র কারণ টেনে মাকে ঢেলে দেবে ফুল-বিল্লপত্তোর। অমনি মাটির কালী নরমুণ্ডু হাতে নিয়ে ধিন্ ধিন্ ক'রে নৃত্য ক'রে উঠবে!

কিন্তু এহেন 'ডোণ্টকেয়ার' কেনারাম একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে!

কেনারামকে আমরা চিরকাল একটা লক্ষ্মীছাড়া, বে-পরোয়া বলিয়াই মনে করিয়াছি। আজ তাহার ভাবান্তর দেখিয়া আমাদের মনটাও কেমন খারাপ হইয়া গেল আহা, বেচারী শেষ বয়সে কি শক্টাই পাইল!

কেনারাম কাঁদিতেছে না,—কেবল মধ্যে মধ্যে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, সবই মায়ের ইচ্ছা!

ভবভূতি বলিয়াছেন, কোনও তড়াগ কাণায় কাণায় ভরিয়া গেলে যেমন তাহার 'পরিবাহ' প্রতিক্রিয়া হয়, শোকের সময় কান্নাও তেমনি শোককে প্রশমিত করে।

কিন্তু কেনারাম কাঁদিতেছে না!

কেহ কেহ বলিল কেনারামকে কাঁদাইয়া দাও, তাহা না হইলে সে শোকে দমবন্ধ হইয়া মারা যাইবে!

হঠাৎ কেনারাম গান ধরিল,—'শক্তিময়ী তুই মা তারা, তোর লীলা কে বুঝতে পারে!'

অনেকে অনুমান করিল, কেনারাম এইবার শ্মশান হইতে আর ফিরিবে না। কেহ বলিল, শক্তি-সাধক লোক, বাঁধন ছিঁড়েছে আর কি ঘরে থাকবে?

স্ত্রীর শবদেহ উঠানে। কেনারামের সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আসিয়াছে। আমরা একরূপ জোর করিয়াই কেনারামকে শ্মশানে লইয়া চলিল। গ্রামের পথ। প্রায় আট-দশ মাইল হাঁটিয়া তবে গঙ্গা। কেনারাম আগে আগে গান ধরিয়া যাইতেছে, 'পাষাণী কে বলে তোরে. ইচ্ছাময়ী তুই মা তারা।

ঠিক নির্ব্বাণের পূর্ব্বাবস্থা!

কেষ্ট বাড়ুয্যে আমার কাণে কাণে বলিল, গিরীশ ঘোষ এক নম্বরের ড্রাঙ্কার্ড ছিল, শেষটায় তাঁর কি হ'ল জানিস ত? থরোলী চেঞ্জড্। একেবারে পায়াস ম্যান, রামকৃষ্ণের মস্তবড় শিষ্য!

বীরেন পাল তাড়াতাড়ি কথা বলে এবং প্রত্যেক ঘটনার একটা না একটা প্যারালাল ইনসিডেণ্ট তার মুখস্থ। সে অমনি চট্ করিয়া মনে করাইয়া দিল, কেন বিল্বমঙ্গলের কি হ'ল? —বিলাসী চিত্তরঞ্জন?

শব তাড়াতাড়ি চলিতেছেন। দেখিয়া এবার কেনারাম নিজেই আসিয়া কাঁধ পাতিয়া দিল! —ইহাই ত' বৈরাগ্য'।

কেনারামের কাপড়ের পুটলীর মধ্যে ঠক্ঠক্ করিয়া কিসের শব্দ হইতেছে। নন্তু বলিল, 'লিমনেড নিয়ে যাচ্ছে নাকিরে ভাই! নন্তু নামকরা ফুটবল প্লেয়ার।

কিছুদূর গিয়াই কেনারাম বোতল লইয়া আর কয়েকজন সঙ্গীর সহিত একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কালোগুপ্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, ঘরে যা' ছিল সব নিয়ে এসেছে। আজ শেষ বোতল টেনে ওপথ একেবারেই ছেড়ে দেবে হয়ত।

নীরেন দার্শনিকের মত বলিল, বড় শোকের সময় ওটা দরকারও হয়।

বীরেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—দেবদাস! দেবদাস কি করল? চরিত্রহীনের সতীশ! কপালকুণ্ডলার নবকুমার?

শব দাহ হইয়া গেল।

কেনারাম গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। আমরা জল্পনা কল্পনা করিতেছি, কি করিয়া কেনারামকে গৃহে ফিরান যায়। এখনই সে হয়ত বলিয়া বসিবে,—বাড়ী? হা হা হা! অন্ধ নর, কারে ভাবো আপন-আলয়? মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা এ সকলি!

কিন্তু কেনারাম তাহা বলিল না। খুব গম্ভীর হইয়া এবং অতিশয় আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোষ্ঠী মানিস?

আমি বলিলাম,—না।

'মানিস'-কেনারাম প্রাজ্ঞের মত পরামর্শ দিয়া বলিল, আমিও আগে মানতাম না। আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে, দুটো বিয়ে,—ফল্‌ল ত'!

ঝরণমুখী

নীহাররঞ্জন সিংহ

"আট বৎসর আগে তার সঙ্গে আমার হয়েছিল মধুর পরিচয়। সেদিন ভেবেছিলাম আমরা দুজনে বাঁধবো একটা প্রেমের নীড়। কিন্তু ঘটনাচক্র আমাদের উপর চক্রান্ত করে, দিল দুজনকেই দুদিকে সরিয়ে। সেখান হতে ফিরে গিয়ে, আমাদের মিলন, হলো অসম্ভব। শেষে, তার হলো না বিয়ে, আর আমি বিবাহিত—"

কলম থামিয়ে চাইলাম দূরে!

এক একটা দমকা হাওয়া এসে লাগছে ঐ নিমগাছটার গায়ে। মাঘের শেষ—ঝরে পড়ছে ঝলকে ঝলকে তার হলুদ রং-এর পাতা, ঘুরপাক খেতে খেতে মাটির বুকে।

দুপুর আর নেই। বেলা ঢলে পড়েছে অনেকটা!

ক্লান্ত দেহে তখনো টেনে টেনে চলেছে ছুটো ছোকড়া গাড়ীর ঘোড়া চাবুক খেতে খেতে।

দূরে একটা কোকিল একবার ডেকেই থেমে গেল লজ্জায়।

সে ভুল করে ফেলেছে। গাঁদা আর গোলাপ তখনো জোর করে হাসার চেষ্টা করছে—যেন বুড়ি মেম সাহেবের ঠোঁটের আর গালের রঙ।

উত্তুরে বাতাসের সঙ্গে টোক্কর খাচ্ছে, দখীনের মলয় হাওয়া।

টেবিলের সামনে কলম আর কাগজ! এলোমেলো ভাবগুলো জটলা পাকাচ্ছে মনে।

—নমস্কার !

লতিয়ে-পড়া দেহটা আরও লতিয়ে দিয়ে হাত দুটি তুলে নমস্কার করে সামনে দাঁড়ায় রেবা ! পেছনে তার মলয় আর পূরবী। পূরবী রেবার বোন।

—এস, হঠাৎ অসময়ে ! কি খবর ?

রেবা বল্লে,—আসছে কাল পূরবীর বিয়ে ? তারা এসেছে নিমন্ত্রণ করতে।

—মলয়ের সাথে পূরবীর বিয়ে ? তা তো জানতাম না ?

—তাই জানাতেই তো এসেছি আমরা।

—তা বেশ, গ্রহণ করলাম তোমাদের নিমন্ত্রণ। কিন্তু— কিন্তু, রেবা তুমি তো এখনো—

রেবার হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। তবু সে হাসবার চেষ্টা করে, ঠোঁটে ভাবের রঙ-তুলিটা টেনে এনে বললে—আমি ? আমি ?— আমার কথা ছেড়ে দাও ! ঐ দেখছো না, পাতা ঝড়ে পড়ছে ! গাঁদা ফুল মলিন হয়ে আস্‌ছে ! আমার দিনের কোকিল লজ্জায় গিয়েছে থেমে ! এখন পূরবীর গানের দিন এসেছে, ওরাই গেয়ে চলুক গান— বসন্তের গান।

তারা আবার নমস্কার করে দরজার বাইরে চলে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ভিতর হতে।

আট বৎসর আগে, রেবার সঙ্গে হয়েছিল আমার মধুর পরিচয়। রেবার হলো না বিয়ে, আর আমি বিবাহিত।

সাহিত্য-সঙ্গীতির কথা

সাহিত্য-সঙ্গীতির কথা

একদিন কৃষ্ণনগরে সাহিত্য ছিল, সাহিত্য সমাজ ছিল। এই সাহিত্য-সমাজ শুধু কৃষ্ণনগরকে সমৃদ্ধ করে নাই, বাংলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহা ইতিহাসের কথা। বাংলা সাহিত্যের যথাযথ ইতিহাস যখন রচিত হইবে, তাহাতে কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সমাজ ও সাহিত্যিকগণের স্থান বোধ হয় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। দুঃখের বিষয় চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলালের আকস্মিক তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনগর তাহার সাহিত্য প্রতিষ্ঠা কতক পরিমাণে হারাইয়া ফেলে। কৃষ্ণনগর সাহিত্য-পরিষদ কোন প্রকারে এখনো টিকিয়া আছে কিন্তু 'পূর্ণিমা সম্মেলন', 'গোবিন্দসড়ক সম্মেলন,' 'আমিনবাজার বাণী সঙ্ঘ' প্রভৃতি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান তৈলহীন দীপশিখার মত অকালেই নিভিয়া যায়। ইহার পরবর্তী কয়েক বৎসর কৃষ্ণনগর সাহিত্য সমাজের অন্ধকার যুগ বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

কৃষ্ণনগরে ১৩৩৮ সালের প্রথমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইল। সে এক স্মরণীয় দিন—যেন অমানিশার শেষে পরম প্রসন্ন প্রভাতের উদ্ভাসন। মরা গাঙে বান ডাকিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের পর অদ্ভুত উন্মাদনা ও উত্তেজনার মধ্যে ১৯৩৮ সালের ৭ই ডিসেম্বরের এক গোধূলি লগ্নে সাহিত্য-সঙ্গীতির শুভ প্রতিষ্ঠা। সে আজ তিন বৎসরের কথা। কালের পরিমাপে তিনটি বৎসরের ব্যাপ্তি খুব বড় কথা না হইলেও সাহিত্য-সঙ্গীতির জীবন-ইতিহাসে তথা কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সমাজের ইতিহাসে ইহা যুগান্তর আনিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইল। সাহিত্যিকগণের কলকাকলীতে কৃষ্ণনগর-সাহিত্য-কুঞ্জবন আবার আজ গুঞ্জরিত। বাংলা সাহিত্য তাঁহাদের নব নব অবদানে সম্পদময়ী।

জনগণচিত্তে সাহিত্য-সঙ্গীতি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এখানে তাহার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙলা দেশের বিশিষ্ট সাহিত্য নায়কগণ ইহার সহিত যুক্ত হইতে গৌরব বোধ করেন। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য্য রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শনাচার্য্য ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি সাহিত্য-দিকপালগণ ইহার বিভিন্ন অধিবেশনে সানন্দচিত্তে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত দেশবিদেশের বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন। আজ আমি তাঁদের কথা বার বার স্মরণ করি।

ব্যক্তি হইতে প্রতিষ্ঠান বড়। ব্যক্তি থাকিবে না, কিন্তু প্রতিষ্ঠান থাকিবে। সাহিত্য-সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি ইহার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে তিন বৎসর যথাসাধ্য সেবা করিয়া আসিয়াছি। আমার পরে অপর কেহ ইহার সেবার ভার গ্রহণ করিবেন। সাহিত্য-সঙ্গীতির দিক হইতে ইহা বোধ হয় বড় কথা নয়; বড় কথা, সমষ্টি-মনের সংহত চিন্তাশক্তিকে এই প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রিভূত করিয়া ইহাকে আরও দিগন্ত-প্রসারী আরও প্রাণবন্ত করিয়া তোলা। পরিচালকত্বের অবসানে ইহাই আমার সাহিত্য-সঙ্গীতির সুধী সভ্যগণের নিকট প্রার্থনা।

শ্রী [illegible] সিংহ

পরিচালক কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতি।

সাহিত্য-সঙ্গীতি প্রতিষ্ঠানকে যাঁহারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন :-

মহারাজ কুমার সৌরীশচন্দ্র রায়
শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধাংশু চন্দ্র মৌলিক
অনন্ত কুমার মিত্র
অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রমোহন সেন
সৌরেন্দ্র নাথ কর
সুশীলকুমার দে আই, সি, এস
ইন্দুভূষণ সেন
শৈবালকুমার গুপ্ত আই, সি, এস
সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
ভূপেন্দ্রনাথ সরকার
অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
রাধারমণ গোস্বামী
অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল
হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ
সুখেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দাশরথী আচার্য
ভূদেবচন্দ্র শোভাকার
হেমচন্দ্র বাগচী
ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
সত্যেন্দ্রনাথ ধর
বীরেন্দ্রলাল রায়
বিরিঞ্চি মোহন পাত্র
বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া
ধরণীধর সান্যাল
ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী
সূর্য্যকুমার সাহা
বীরেন্দ্রমোহন আচার্য
ফণিভূষণ পাঠক
ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
এস, এম, আকবরুদ্দিন
অতুলকৃষ্ণ গুপ্ত
ফজলুর রহমান
অতুল্যচরণ দে
অনন্ত প্রসাদ রায়
সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
অমিয় ঘোষ

অবিনাশ চন্দ্র রায়
বৈদ্যনাথ দত্ত
কাশীপ্রসাদ রায়
সীতেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী
কানাইলাল দাস
শিবপদ চট্টোপাধ্যায়
রাখালদাস সিংহ
সুধাংশুশেখর রায়
অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
করুণাময় ভট্টাচার্য্য
অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ সান্যাল
অক্ষয় কুমার মিত্র
শ্যামলানন্দ রায়
জিতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য
বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী
ফণিভূষণ বিশ্বাস
মোহনকালী বিশ্বাস
সরোজবন্ধু দত্ত
নির্মলচন্দ্র সিংহ
সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

নন্দগোপাল পাঠক
গোপাল চন্দ্র ঘোষ
অজিতকুমার পাল চৌধুরী
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
দেবেন্দ্র নাথ সেন
কালিপদ বাগ
প্রফুল চন্দ্র রায়
কার্ত্তিক চন্দ্র পাল
জিৎসিং সাহেলা
কালিপদ ভট্টাচার্য
নির্মল চন্দ্র দত্ত
অশোকা গুপ্তা
সুধা সেন
অমিয়া দাসগুপ্তা
বীণা রায়
অন্নপূর্ণা রায়
সুরমা রায়
শান্তিপ্রিয়া শোভাকর
বেণু রায়
নীলিমা সরকার
শেফালিকা বসু
বাণী তালুকদার
প্রভৃতি।